558

1300

7068
S.I.E

নির্ম্মাল্য

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব ভবন, চুঁচুড়া

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

নির্ম্মাল্যের গল্পগুলি পূর্ব্বে ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দুই-চারিটি গল্প ইংরাজী গল্পের ভাব লইয়া রচিত, অপরগুলি মৌলিক।

গৃহকর্ম্মের অন্তরালে গল্পগুলি রচিত, সাহিত্যে কিছু-একটা সৃষ্টি করিব, সে উদ্দেশ্যে নহে। এক্ষণে যদি গল্পগুলি পাঠ করিয়া কোন সহৃদয় সুধী পাঠক-পাঠিকা একটুও আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার এ গ্রন্থ-প্রকাশ সার্থক জ্ঞান করিব।

আমার পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহ ও যত্ন ভিন্ন 'নির্ম্মাল্য' প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কি না, সন্দেহ! তাঁহার বাণী-সেবা সার্থক হউক, ইহাই আমার আন্তরিক-আশীর্ব্বাদ।

কলিকাতা
১৫ আশ্বিন, ১৩১৯

লেখিকা

আজি মা শরতে কুসুম তুলিয়া ভরেছি ডালি,—
কল্যাণময়ী,—তোমারি চরণে দিব তা ঢালি !
গাঁথিতে জানি না, পারি নি গাঁথিতে চিকণ মালা,
বাছিতে জানি না, বনফুল তুলি ভরেছি ডালা,
সাজাতে জানি না, পারি নি সাজাতে মনের মত,
তবুও এসেছি কমল চরণে সঁপিতে মাতঃ,
—নহে এ যোগ্য, অর্ঘ্য দিতে মা,—বনের ফুল,
গন্ধবিহীন, অন্ধ স্নেহ ত বোঝে না ভুল !
তাই ত এসেছি, অসঙ্কোচে মা, দিতে ও পায়,—
হউক তুচ্ছ, জানি, তুলে লবে স্নেহের ছায় ।

সূচী

নির্ম্মাল্য

খাতা

স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া সুশীলের প্রশংসা থাকিলেও বাড়ীতে তাহার দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না। ছেলে হইয়া বাঁচে না, তাই অনেক দুঃখের সুশীল বাবা ও ঠাকুরমার নিকট বেশী মাত্রায় আদর পাইয়া, দুষ্ট ঘোড়ার মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিবাসী বা সহপাঠী, কোন বালকের সহিতই তাহার সদ্ভাব ছিল না। ছোট বোন্ লীলাকেও তাহার সমস্ত আব্দার ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। লীলার মত সহিষ্ণু সঙ্গীও তাহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। লীলা বড় শান্ত মেয়ে। তাহার ঘন পক্ষ্মপরিবেষ্টিত বড় বড় কালো চোখদুটিতে তাহার হৃদয়ের নির্ম্মলতা ফুটিয়া উঠিত। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি করুণা ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। দাদার নিকট অকারণ লাঞ্ছিত হইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করিত না। পাছে মা জানিতে পারিয়া দাদাকে ভর্ৎসনা

করেন, সেই ভয়ে সে কাঁদিতেও সাহস করিত না। সুশীল অন্যায়রূপে দাস-দাসীদের প্রতি অত্যাচার করিলে, সে সঙ্কুচিতভাবে মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং দৈবাৎ তাহা সুশীলের চক্ষে পড়িলে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য যথাবিহিত শাস্তিও সে গ্রহণ করিত ; তথাপি দাদাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। মা যদি সুশীলের উপর রাগ করিয়া কোনদিন তাহাকে সুশীলের নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন, তবে তাহারই পক্ষে তাহা শাস্তিস্বরূপ হইয়া উঠিত।

সুশীল যে লীলাকে ভালবাসিত না, এমন নয়। কিন্তু সে ভালবাসার মর্ম্ম সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। সে নিজে ভগ্নীর প্রতি যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করিত, তাই বলিয়া অন্য কেহ কিছু বলিবে, কেন? তাই সে কাঁদিয়া কাটিয়া, মাথা খুঁড়িয়া অনর্থ করিয়া তুলিত। জলখাবারের পয়সা জমাইয়া চিনে মাটির পুতুল, জলছবি, লজঞ্চুস প্রভৃতি কিনিয়া সে ভগ্নীকে উপহার দিত ; আবার রাগের সময় সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেও ত্রুটি করিত না। লীলা তাহার পুতুলগুলির শোচনীয় পরিণামে মনে মনে ব্যথিত হইলেও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না ; এবং ক্রোধোপশমে সুশীল যখন গঁদ ভিজাইয়া, গালা গলাইয়া, পরম গম্ভীর মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ পুতুলগুলির সংস্কার-কার্য্যের নিষ্ফল চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিত, তখন লীলা অত্যন্ত প্রশংসমান নেত্রে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া তাহা দেখিত।

মার অনুরোধে সুশীল লীলার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। লীলাও প্রথম দিন-কতক খুব উৎসাহের সহিত 'ক'য়ে আকার 'কা', আর

'ক',—'কাক প্রভৃতি বানান, ক্রমশ বালীর কাগজের খাতায় মোটা সরের কলম দিয়া রুল টানিয়া আঁকা-বাঁকা অক্ষরে যথেষ্ট কাটকুট করিয়া ও কালি ফেলিয়া 'সুশীল সুবোধ বালক' প্রভৃতি পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল; এবং পুস্তকোল্লিখিত সুশীল বালককে আপনার অগ্রজের আসনে বসাইয়া মনে মনে পরম প্রীতিমিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল. কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার উৎসাহ কমিয়া আসিল, তথাপি দাদাকে খুসী করিবার জন্য একদিনের জন্যও সে লেখাপড়ায় আলস্য করিল না। সমস্ত দুপুর-বেলাটা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কোন গতিকে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে এক পৃষ্ঠা মাত্র লেখা শেষ করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সে তাহা দাদাকে দেখাইত, কিন্তু 'আহা, কি লেখার ছিরি! যা, তোর কিচ্ছু হবে না!' ইত্যাদি রূপে ভর্ৎসিত হইয়া ম্লান মুখে খাতাখানি রাখিয়া দিত, এবং পরদিন যথাসময়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লিখিতে বসিত। উৎসাহটা প্রারম্ভে যতখানি থাকিত, বসিলে অবশ্য ততটা থাকিত না।

অবশেষে ছয়মাস কাল নিন্দিত, প্রহৃত ও অনবরত পাঠে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াও যখন দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল না; এবং ধারাপাত পড়িয়া এক টাকায় আটটা আধুলি ও ছয় দ্বিগুণে সত্তর প্রভৃতি বলিয়া লীলা অঙ্ক-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন প্রবল অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সুশীল একদিন তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ইতিপূর্ব্বে এত বড় মূর্খ সে আর কখনও দেখে নাই, লীলার ভবিষ্যতে যে আর কিছু হইবে, এমন ভরসাও বড় নাই! সুশীলের এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, তাহা নহে। কিন্তু দাদার কথায় লীলার কখনও অবিশ্বাস হইত না, তাই

সে আপনার হীনতা ও মূর্খতার বিষয় ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল, এবং অচিরকালের মধ্যেই লেখাপড়া ছাড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

লেখাপড়ায় মন থাকিলেও সংসারের কাজ-কর্ম্মে তাহার আলস্য ছিল না। দাদার কাপড় ঠিক করিয়া রাখা, স্কুল হইতে সুশীল ফিরিয়া আসিলে তাহার বইগুলি গুছাইয়া রাখা, মার হাত হইতে জলখাবারের রেকাবিখানি লইয়া আসন পাতিয়া দাদাকে খাইতে দেওয়া, এবং ছুটির দিন মাকে লুকাইয়া সুশীল যখন কাঁচা আম ও পাকা নোড়ের সন্ধানে দুপুরের রোদে আঁকশী হাতে বাগানে বাগানে ঘুরিত, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকা—প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক কাজই তাহাকে করিতে হইত। সকালবেলা ঠাকুরমার পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া একখানি ছোট ডালায় চন্দন-চর্চ্চিত ফুলগুলি লইয়া 'পুণ্যি-পুকুর', 'হরির চরণ' ইত্যাদি ব্রত করিয়া দাদা বাবা,মা, ঠাকুরমা সকলের মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট সে প্রার্থনা করিত ; এবং সুশীলের আহারের সময় প্রবীণা গৃহিণীর মত, 'ওটা খাও', 'এটা খেলে না' বলিয়া অনুনয় করিত। অভ্যাসের বশেই হউক, বা যে কারণেই হউক, লীলাকে না হইলে সুশীলের একদণ্ড চলিত না। অথচ সে যখন কোন সস্নেহ বাক্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে যাইত, তখনই অর্দ্ধ পথে 'যা, যা, তোর আর গিন্নিপণা করতে হবে না,' বলিয়া সুশীল তাহাকে থামাইয়া দিত।

২

দেখিতে দেখিতে লীলা নয় উত্তীর্ণ হইয়া দশ বৎসরে পড়িল। আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, কাজেই হেমাঙ্গ বাবু কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। হরিশপুরের রায়েদের বাড়ী হইতে বাবুরা একদিন লীলাকে দেখিতে আসিল। বাঙ্গালীর মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই অভিভাবিকা-দিগের নিকট হইতে শ্বশুরবাড়ীর প্রতিকূলে নানারূপ ভীতিপ্রদ মন্তব্য শুনিয়া সে সম্বন্ধে একটা আদর্শ ঠিক করিয়া রাখে। লীলারও যে এ বিষয়ে অল্প অভিজ্ঞতা না জন্মিয়াছিল, এমন নহে। তাই মা যখন জরি জড়াইয়া আঁট করিয়া, কেশরাশি কবরীবদ্ধ করিয়া অলঙ্কার-বস্ত্রে তাঁহাকে যথাসাধ্য মণ্ডিত করিয়া, মনের মত সাজাইয়া, তাহার স্বাভাবিক শ্রীকে বিলুপ্ত করিয়া তুলিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইলেন, তখন লীলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত-ভাবে মার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া জানাইল, সে বিবাহ করিবে না! কন্যার কথায় কন্যার আসন্ন বিরহ-বেদনা মার মনেও জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চক্ষুপল্লবও অল্প আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল! তথাপি তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছি মা, ও কথা বলতে নেই, জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে চিরদিন সেই ঘর কর।"

মেয়ে জন্মিলে বিবাহ যে অনিবার্য্য, তাহা যে ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তাহাও তিনি তাহাকে বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। সুশীল এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ভগ্নীর সজ্জা-প্রিয়তা ও জননীর অজ্ঞতা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, এবং চুল বাঁধিবার জন্য মা লীলাকে আটক করিয়া রাখায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল। মার কথায় সে প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল, "সে হবে না! লীলা কিছুতেই বিয়ে করবে না।"

মা রাগ করিয়া বলিলেন, "এমন অলুক্ষুণে ছেলেও ত দেখিনি! ও কথা বলতে নেই, তুই থাম্।"

সুশীল মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "তুই উঠে আয়, তোকে বিয়ে কর্ত্তে হবে না।"

৩

তথাপি লীলাকে বিবাহ করিতে হইল। পাত্রপক্ষ খুব বড়মানুষ। ছেলেটি 'দোজবরে' হইলেও বয়স বেশী নয়। 'দোজবরে' বলিয়া অল্প পয়সায় শুভকার্য্য সমাধা হইল। লীলা নয় উত্তীর্ণ হইয়া দশে পড়িয়াছে মাত্র। এ বয়সে মেয়ে রাখা যায় না, এমন নয়, তবে উপস্থিত ত্যাগ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই বুদ্ধিমান হেমাঙ্গবাবু অল্প পয়সায় কন্যাদানের এমন শুভ অবসর ত্যাগ করিলেন না।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই একটা ভাল দিন দেখিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করা হইল। সুশীল প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু কেহই যখন তাহার কথায় মন দিল না, তখন সে কাগজের মালা ও ফানুস তৈয়ারি-কার্য্যে মনোযোগ দিল। লীলা এ কয়দিন ম্লান মুখে ছায়ার মত দাদার পশ্চাতে ফিরিতেছিল, দাদার তখন সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না।

বিবাহের পরদিন নবজামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিতা চন্দনচর্চ্চিতা বধূবেশিনী লীলার কম্পিত শীতল হস্ত জামাতার হস্তে রাখিয়া "আমার ধন তোমায় দিলুম" বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে হেমাঙ্গবাবু যখন মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিলেন, তখন সমাগত সকলের চক্ষুই আর্দ্র হইয়া উঠিল। লীলাও সকাল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুশীল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া এই বিদায়দৃশ্য দেখিতেছিল। ক্রন্দনাকুলা লীলা যখন মা, বাবা ও দাদার চরণ বন্দনা করিয়া পাল্কীতে আরোহণ

করিল, তখন সুশীলের সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, অশ্রুরাশি উথলিত হইয়া তাহার চক্ষু রুদ্ধ করিয়া দিল। অশ্রু-কুয়াশার মধ্য দিয়া লীলার পাল্কী দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে, সে ধীরে ধীরে অন্য মনে পড়িবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত দিন কোন কাজে খেলায় সে মন দিতে পারিল না। আপনাকে অত্যন্ত একা অসহায় মনে হইতে লাগিল। চারিদিকের সমস্ত দ্রব্য সেই ক্ষুদ্র বালিকার সহস্র স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় অভ্যাসবশত দ্বারের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। আজ আর দুইটি উজ্জ্বল, আনন্দোৎফুল্ল, ঘনপল্লবমণ্ডিত, কালো চোখ তাহার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া নাই! পড়িবার ঘরে পাঠ্যপুস্তক অযত্নে বিক্ষিপ্ত, কেহই তাহা গুছাইয়া রাখে নাই! উৎসবের অবসানে বিদায়-প্রাপ্ত রশুনচৌকির দল আপনার ইচ্ছামত বিদায়ের সুর বাজাইয়া যাইতেছিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া সুদূর-প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন অসমতল 'মেঠো' রাস্তায় ক্বচিৎ দুই একজন পথিক, ও অদূরবর্তী শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে মৎস্যলোলুপ দুই একটা উলঙ্গ ধীবর-বালককে দেখা যাইতেছিল।

সুশীল দৃষ্টি ফিরাইয়া লীলার পুরাতন, মলাট-ছেঁড়া, আঁকা-বাঁকা অক্ষরে পরিপূর্ণ বালীর কাগজের খাতাখানি লইয়া অন্য মনে পাতা উল্টাইতে লাগিল,—সহসা একটা জায়গায় তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লীলা তাহার চিরপরিচিত বড় বড় হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, "দাদা আজ আমায় একটা পুতুল দিয়াছে। দাদা আমাকে ভালবাসে। আমিও দাদাকে ভালবাসি।" তলায় তাহার নাম। অতি-বৃষ্টির অবসানে

ডাল নাড়া দিলে, ঝর্ ঝর্ করিয়া যেমন পত্রসঞ্চিত সমস্ত জল ঝরিয়া পড়ে, সুশীলের সযত্নরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি তেমনই ভাবে ঝরিয়া পড়িল। এই কয়টা কালীর অক্ষরে বালিকা ভগিনীর হৃদয়ের ছবি সে আজ পূর্ণ প্রকাশিত দেখিল। তাহার প্রত্যেক অক্ষরে যে বিশ্বাস, যে সরল স্নেহ, যে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জন্মাবধি একত্র অবস্থানেও সে যে কেন তাহা অনুভব করিতে পারে নাই, তাহাই ভাবিয়া সে বিস্মিত হইল। কষ্টের মধ্যে এমন আনন্দও সে জীবনে কখনও পায় নাই!

বিদায়-দিনে লীলার অশ্রুপরিপ্লুত, বিষণ্ণ মুখচ্ছবি, স্নেহমণ্ডিত মহিমময়ী দেবীর মুখশ্রীর মতই, তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ত্রস্ত হস্তে চক্ষু মুছিয়া সুশীল লীলার অসমাপ্ত ডায়েরীর নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখিল, "লীলা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। সে এবার ফিরিয়া আসিলে আর কখনও তাহাকে কিছু বলিব না, এবার হইতে তাহাকে খুব ভালবাসিব।"

সার্থক

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী-বিয়োগ হইলে যখন বলিলাম, "দ্বিতীয় বিবাহ আমার পক্ষে অসম্ভব", তখন আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই মুখ টিপিয়া অলক্ষ্যে একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ,—ব্যাপারটা একবারে অসম্ভব হইতে পারে না। সেই ঈষৎ পরিহাস-মিশ্রিত, অতি সূক্ষ্ম হাসিটুকু সূচীর মত, আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমার সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল।

আমি বরাবরই সাধারণের চেয়ে নিজেকে অনেকখানি তফাৎ করিয়া দেখিতাম। সাধারণে যেখানে স্ত্রী-বিয়োগের অল্পকাল পরেই দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করে এবং পুত্রকন্যাদির লালন, কিম্বা সাংসারিক অসুবিধার উল্লেখ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখিতে চায়, সেখানে ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে!

আমার প্রথম স্ত্রী শৈলবালাকে আমি যথেষ্ট ভালবাসিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সে ভালবাসা অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়! উপন্যাসের নায়ক তাঁহার প্রণয়িনীকে যেমন ভালবাসেন, অনেকটা যেন সেইরূপ!

সতেরো বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল। শৈলর বয়স তখন দশ বৎসর। কলিকাতায় একটি ছোট বাসায় থাকিয়া আমি এফ-এ'র জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। একজামিনের পড়া কতদূর অগ্রসর হইতেছিল, তাহা একজামিনাররাই বলিতে পারেন; কিন্তু বড় বড়

সম্বোধন দিয়া সোনালি ঝক্‌ঝকে কাগজে যথেষ্ট ভালবাসা ও সেণ্টের সৌরভ মাখাইয়া প্রেমপত্র লিখিতে যে অনেকখানি সময়ের সদ্ব্যবহার হইত, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমাদিগের কলিকাতার বাসায় আমার এক জ্ঞাতি খুল্লতাত-পুত্র থাকিত,—তাহার নাম, অনুকূল। সেও এফ-এ পড়িতেছিল। কিন্তু নিজের উপর সে বেচারার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার নিকট সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিত। এক কথায় সে আমায় একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল। কালে আমি যে একজন দ্বিতীয় "ম্যাটসিনি", "গ্যারিবল্‌ডি" কিম্বা অন্ততঃ-পক্ষে সুরেন্দ্র বন্দ্যো হইতে পারিব, সে সম্বন্ধে তাহার এতটুকু সন্দেহ ছিল না! অর্থাৎ অনুকূল যে কেবল আমায় ভালবাসিত, তাহা নহে, দেবতার মত ভক্তি করিত। আমার কথা বেদ-বাক্যের মতই সে বিশ্বাস করিত।

এই সময় কবিতাদেবী সহসা আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকের দারুণ শীতে মাথার শিয়রের জানালা খুলিয়া দিয়া আমি যখন "অন্ধকারের ভাষা" কিম্বা "প্রতিপদের চাঁদ" লইয়া কবিতা লিখিতাম, তখন বেচারা অনুকূল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া হিমের হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। আশ্চর্য্য, একদিনের জন্যও আমার কার্য্যে সে প্রতিবাদ করিত না। কিন্তু কবিতা লিখিয়াই শুধু তৃপ্তি হয় না, পাঠকের প্রয়োজন! অনুকূল অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে আমার কবিতার প্রশংসা করিত, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের উপর আমার আসন নির্দ্দেশ করিত! আমিও যে অতি সহজে তাহা গ্রহণ করিতাম, এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

এইভাবে একজামিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে "ফেল" হইতে বেশী ক্লেশ পাইতে হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অনুকূলটা ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস হইয়া গেল। বাবা খুব রাগ করিলেন! আত্মীয়-বন্ধুরা দিন-কতক কবিতা ও চিঠি লেখা বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিলেন। কেবল দুইটি ভক্ত হৃদয় আমার মহিমা-গৌরবে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করিতে দিল না। অনুকূল বলিল, "পাস ত সবাই করে, এতে আর বাহাদুরি কি? এবার না হয়, ফিরে বারে হবে। কিন্তু প্রতিভা ত আর সকলের থাকে না" ইত্যাদি। স্ত্রী শৈলবালাও তাহাতে সম্পূর্ণ মত দিলেন। কিন্তু এই দুইটি ভক্ত হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস-সত্ত্বেও নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেকখানি কমিয়া গেল। লজ্জিতভাবে পূর্ণবেগে আমি পড়ায় মন দিলাম।

পর-পর একজামিন দিয়া যখন "এম-এ" পড়িতে আরম্ভ করিলাম, সেই সময় একদিন বসন্তের প্রভাতে বসন্ত-মঞ্জরীর মতই কোমল লাবণ্য-ভরা দেহ ও পরিপূর্ণ হৃদয়-ভরা প্রেম লইয়া, আমার ষোড়শী স্ত্রী আমারই চক্ষের সম্মুখে তাঁহার অসম্পূর্ণ ঘরকন্নার মধ্যে অসম্পূর্ণ জীবন-পথে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম আমার সংসার শূন্য, পৃথিবী তিক্তস্বাদ, জীবনধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইয়াছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট, বৃন্তচ্যুত, শুষ্ক পত্রের মত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু মানুষ চিরদিন শোক বহিয়া বেড়াইতে পারে না, আমিও আমার রসায়নের যন্ত্রগুলার উদ্ধার সাধন করিয়া বিজ্ঞানের বই খুলিয়া বসিলাম। দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমার পুনরায় বিবাহের জন্য বহু অনুরোধ-উপরোধ—

এমন কি অশ্রুবর্ষণ পর্য্যন্ত ঘটিয়া গেল। কিন্তু আমি দৃঢ়চিত্তে জানাইলাম যে, এভাবে উৎপীড়ন করিলে অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন এক মুহূর্ত্তে চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল।

২

আমার স্ত্রী-বিয়োগের দুই বৎসর পরে অনুকূলের এক শ্যালিকার বিবাহে অনুরুদ্ধ হইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে অনুকূলের শ্বশুর-বাড়ি তারাপুর গেলাম।

তারাপুর একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে সহরের অবিরাম কার্য্য ও জন-স্রোত সমস্ত সহরকে সচকিত করিয়া রাখে না। ঘোড়ার গাড়ী ক্বচিৎ দেখা যায়। প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধ অঞ্চলতলে সমস্ত গ্রাম যেন সুখসুপ্ত। বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গেলে অনুকূল প্রস্তাব করিল, একদিন শিকারে যাইতে হইবে। শিকারে আমার বরাবরই উৎসাহ ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া বন্দুক-হস্তে আম্র ও অশোক বৃক্ষের ছায়ায় ঢাকা মেটে রাস্তা দিয়া শিকারে বাহির হইলাম। মনে পড়িল, পঠদ্দশায় যখন আমরা কলিকাতায় থাকিতাম, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাটী আসিয়া দুই বন্ধুতে এমনই করিয়া শিকারে বাহির হইতাম। তখনকার সে দিনগুলি কি মধুর, কি লোভনীয়ই না ছিল! বয়স ও অবস্থার সহিত মানুষের মনেও কি পরিবর্ত্তন ঘটে!

আমাদের গন্তব্য স্থান অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। অনুকূলের শ্বশুরবাড়ীর অনতিদূরে পশ্চিম প্রান্তে জমিদার বাবুদের একটা খুব

বড় আমবাগান ছিল। তাহারই কিয়দংশ বড় বড় কালকাসুন্দে ও সেওড়া প্রভৃতি নীচ জাতীয় বৃক্ষে ভরিয়া জঙ্গলের মত হইয়াছিল। যদিও সে জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক কিম্বা অপর হিংস্র জন্তুর লুক্কায়িত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তথাপি আমরা ঐ স্থানটিকেই শিকারের জন্য মনোনীত করিয়াছিলাম। বাগানের ভিতর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সংস্কার-হীন পঙ্কিল পুষ্করিণী, কোথাও বা শৈবালাচ্ছন্ন ডোবা। তাহাতেই রৌদ্র-কাতর জলচর পক্ষী ও কয়েকটা কর্দ্দমাক্ত পাতিহাঁস মহা কলরব তুলিয়া সাঁতার কাটিতেছিল। আমাদের পদশব্দে দুই একটা খরগোস ও কাঠবিড়ালী শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া ইতস্তত ছুটিয়া পলাইল। একটা জামগাছের উপর এক ঝাঁক ডাক্ পাখী দল বাঁধিয়া কোলাহল তুলিয়া স্তব্ধ মধ্যাহ্নকে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল। তাগ্ করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। পরক্ষণেই কাতর কণ্ঠের একটা অস্ফুট চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমরা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত অগ্রসর হইয়া,—যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব!

জীবনে এমন কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, আমাদের হাত পাঁচ সাত দূরে একটা অপরিচ্ছন্ন ডোবার ধারে একটা হেলিয়া-পড়া জামগাছের তলায় বসিয়া এক বালিকা আমারই অপরাধের সাক্ষ্য-স্বরূপ সেই রক্তাক্ত আহত পক্ষীটিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দিয়া তাহার রক্ত মুছিয়া দিতেছেন। তাঁহার চোখের জলে পাখীটির রক্ত-স্রোত ধৌত হইয়া গিয়াছে। মেয়েটির পায়ের কাছে চারিদিকে রাশীকৃত জাম পড়িয়া আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে তিনি ফল সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছিলেন। আমার মনে পড়িল, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।" যে নিষ্ঠুর দৃশ্য দস্যুকে মহাকবির আসন দিয়াছিল,

আজ যেন তাহাই দিবালোকে সেই চির-অতীতের যবনিকা তুলিয়া আমার চক্ষে এক অপূর্ব্ব মায়া-লোক সৃজন করিয়া দিল। আমিই যে সে নিষ্ঠুর দৃশ্যের একমাত্র অভিনেতা, তাহাও যেন ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল, এ বুঝি কাব্য জগতে আসিয়াছি, এখানে শুধু স্নেহ, শুধু করুণা, আর এই যে করুণাময়ী নারী—এ বুঝি চিরদিন এমনই ভাবে আর্ত্তের শুশ্রূষা করিবার জন্য অবতীর্ণা! আর যে ঠিক কি ভাবিয়াছিলাম, তাহা নিজেই বলিতে পারি না, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শিকার কার্য্যটাকে যে এত বীভৎস বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা নিশ্চয়।

বন্দুক হস্তে আমাদের দুই শিকারীকে দেখিয়া মেয়েটি এমন গভীর ঘৃণা-পূর্ণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া দেখিল, যেন আমরা ভয়ানক দুষ্কৃতকারী কোন রাজদণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধী! অনুকূল কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি, কমলা! তুমি এখানে! তা কি আমরা জান্‌তুম? জান্‌লে কখনই এত বড় বেয়াদবি করতে সাহস করতুম না।"

কমলা উত্তর দিল না, সে উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "যদি বিশ্বাস করে পাখীটি আমায় দেন, একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি বাঁচাতে পারি!"

কমলা বিনাবাক্যে পাখীটি আমার হাতে ফিরাইয়া দিল, একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। আমিও তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; চারি চক্ষের মিলন হইল। কমলা লজ্জিতভাবে মুখ নত করিল। আমার মনে হইল, ঐ দৃষ্টির বিনিময়ে শত সহস্র পাখীর জীবন-দানও অতি তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু হায়, মনুষ্যের ক্ষুদ্র

শক্তিতে সেই তুচ্ছ ব্যাপারও বৃহৎ হইয়া উঠে। আমার প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টায় পাখীটির ভবযন্ত্রণা শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল! আশ্চর্য্যের বিষয়, অনুকূল আমার কার্য্যে সাহায্য না করিলেও বাধা দিবার চেষ্টা করিল না। বালিকার সযত্ন-সঞ্চিত স্তূপীকৃত জাম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সে তদ্‌ ভক্ষণে মনোনিবেশ করিল।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই অনুকূলের কাছে কমলার পরিচয় লইলাম। কমলা অনুকূলেরই এক জ্ঞাতি খুড়-শ্বশুরের কন্যা। কমলার পিতা রামতারণ বসু একজন দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার। দশ টাকা মাত্র বেতনে তাঁহার সংসার চলে। কমলা পিতার বড়ই আদরের কন্যা। মেয়েটি দেখিতে যেমন সুন্দরী, গৃহকার্য্যে, আচার-ব্যবহারেও তেমনই সুশীলা, আর পল্লীগ্রামের মেয়েদের পক্ষে যাহা অনেকটা অসম্ভব, তেমনই ভাবে সুশিক্ষিতা। পিতা স্বহস্তে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু রূপ বা গুণ থাকিলে সংসারে মেয়ের বিবাহের যথেষ্ট সার্টিফিকেট হয় না। মেয়ের রং কালো হইলে সাবান পাউডার সংযোগে, চুল না থাকিলে জবজবে করিয়া তৈল লেপিয়া, চোখ ছোট হইলে সুর্‌মা লাগাইয়া কোনরূপে কাজ সারিয়া লওয়া চলে, কিন্তু কন্যার পিতার অর্থাভাব থাকিলে বিবাহ একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। তাই মেয়েটির বয়স অধিক হইলেও বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি পাড়াপড়সীর নিদ্রা-হীনতায় ও গৃহিণীর গঞ্জনায় রামতারণ তাঁহার কমলার জন্য নারায়ণের আশা ত্যাগ করিয়া এক পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। পাত্রটী কোন পাটের কলের গুদাম-সরকার। মেয়েটির রূপ দেখিয়া পাত্র বিনা

যৌতুকেই বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছেন। কারণ বৃদ্ধেরা রূপ দেখিয়া যতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, যুবারা তাহা পারে না।

অনুকূলের বক্তৃতা কতক্ষণ চলিয়াছিল, বলিতে পারি না। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, আহা, এমন মেয়েটী, শেষ কিনা একটা গণ্ডমূর্খ বৃদ্ধ গুদাম-সরকারের সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তাহার ব্যর্থ জীবন বহন করিবে! করুণায় আমার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কোন লোক অর্থ-সাহায্য করে, তবে মেয়েটির কোন সুপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না!

অনুকূল মাথা নাড়িয়া জানাইল, তবু কোন আশা নাই! কারণ দরিদ্র রামতারণ বসু অর্থহীন হইলেও তাহার সম্মানবোধ কিছু অধিক। সে কাহারও নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তবে যদি কোন পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ বা কোন বিপত্নীক দয়া করিয়া মেয়েটিকে গ্রহণ করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। উপসংহারে অনুকূল বিশেষ করিয়া জানাইল যে, কমলার অদৃষ্ট অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাহার উদ্ধারের কোনই আশা নাই।

তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। দূরে ঝিল্লি ও ভেকের কলরব স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বাগানে গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। বৃষ্টির ছাট আমার গায় আসিতে লাগিল। একটা অকারণ বেদনায় আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল!

৩

কমলাকে বিবাহ করিয়া আবার নূতন সংসার পাতিলাম। বলা বাহুল্য, উভয়পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইলেন না।

কেবল দুই-একজন পরিহাসপ্রিয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় বিবাহটা কিরূপ অনুমান হইতেছে ?" অনুকূল বার বার করিয়া সকলকে বুঝাইতে চাহিল যে, এ বিবাহ শুধু অনাথার প্রতি করুণা! ইহাতে হৃদয়ের ব্যাপার কিছুই ছিল না।

সত্য কথা বলিতে কি, কথাগুলা আমার ভাল লাগে নাই। অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিবার বল আমার আছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কার্য্যে আমি কোন দোষ দেখি নাই, এবং অপর কেহও দেখে নাই।

বধূ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। মা আসিয়া, "এস, আমার ঘরের লক্ষ্মী, এস" বলিয়া বধূকে বরণ করিয়া লইলেন। দেখিলাম, তাঁহার সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। মনে পড়িল,—আর একদিন এমনই উৎসব-কোলাহলের মধ্যে, নোলকপরা, অশ্রুভরা, লজ্জানত, একটি সুন্দর মুখ লইয়া এমনই করিয়া একজন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে আজ কোথায়!

অল্পদিন পরেই বুঝিলাম, ভুল করিয়াছি। কমলাকে সুখী করিতে গিয়া দারুণ অসুখী করিয়া তুলিয়াছি। যদিও আত্মীয়-স্বজন হইতে দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলেই কমলাকে ভালবাসিত, বাবা কমলাকে "মা লক্ষ্মী" বলিয়াই ডাকিতেন, আমার বোন নীরুর মতই তাহাকে স্নেহ যত্ন করিতেন, এবং আমি?—সে কথা না বলাই ভাল—তথাপি কমলা অসুখী। ভালবাসা মানুষকে দিব্য দৃষ্টি দান করে। তাই আমি বুঝিয়াছিলাম, এ বিবাহে কমলা সুখী হইতে পারে নাই।

কমলা গরীবের ঘরের মেয়ে। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে তাহার

শ্রান্তি বা আলস্য ছিলনা। অল্প দিনের মধ্যেই সে তাহার ধনীগৃহ-দুর্ল্লভ কর্ম্ম-পটুতায়, মিষ্ট কথায় ও মিষ্ট হাসিতে সকলকে বশ করিয়া লইয়াছিল। কমলার স্বাস্থ্যপূর্ণ সরল সুন্দর মুখে এমন-একটি শান্ত শ্রী, স্নিগ্ধ লাবণ্য মণ্ডিত ছিল, যাহা একবার মাত্র দেখিলেই মনের মাঝে মুদ্রিত হইয়া যায়! কমলার ব্যবহারে এমন কোন অপরাধ দেখা যায় না, যাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু তাহার অনলস সেবা-যত্ন ও আদেশ-পালনের মধ্যে যেন কোন জীবন্ত ভাব নাই। তাহা শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধ মাত্র! আমি কন্যাদায় হইতে তাহার পিতাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই যেন সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ; শুধু এইটুকু মাত্র, আর কিছু নয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী কি শুধু ঘর-কন্নার কাজ করিবার যন্ত্র! আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে আমি কিছুতেই নিজের আয়ত্তাধীন মনে করিতে পারিতাম না। কাচের বাসন যেমন একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর ঠিক খাঁজে-খাঁজে জোড়া লাগে না, লাগিলেও জোড়ের দাগ থাকিয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের খাঁজেও তেমনই জোড়ের দাগটুকু মিলাইতেছিল না, বরং স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। যে জিনিষ পাওয়া যায় না, তাহা পাইতে আগ্রহ হয়, অধিক। আমার সমস্ত হৃদয় ভালবাসার আগ্রহে ও কবিত্বে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মনে হইত, হঠাৎ একটা বসন্তের দমকা হাওয়া আসিলে একদিন বুঝি তাহা উচ্ছ্বসিত, উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু বসন্তের হাওয়াও আসে, আমার রুদ্ধ হৃদয় শুধু বেদনায় টন্ টন্ করিতে থাকে। দূরে থাকিয়া মনে হয়, কমলাকে এই কথা বলিব, এইরূপে আদর করিব,—কাছে আসিলে

সেগুলা কিন্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়। যদিই বা কোনদিন আকস্মিক উচ্ছ্বাসে কোন ভালবাসার কথা বলিয়া ফেলি, আমার স্ত্রী এমনই আগ্রহ-শূন্য, অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহা গ্রহণ করেন যে, মনে হয়, আমার সমস্ত আদর-সোহাগ তাঁহার বর্ম্মাচ্ছাদিত মনের বাহির হইতেই স্খলিত হইয়া ফিরিয়া আসে! প্রথম প্রথম তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভাল ভাল কাব্য উপন্যাস আনিয়া পাঠ করিতাম। অনেক হা-হুতাশ ও অশ্রুসিক্ত কবিতা লিখিয়া অসাবধানে তাঁহার চোখের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিতাম। আবার কখন বা কোন সৌখীন দ্রব্য আনিয়া উপহার দিতাম। কিন্তু পাথরে যেমন দাগ বসে না, তাঁহার অবিচলিত মুখে তেমনই কোন ভাব জাগিত না। সাংসারিক অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের সহিত তিনি আমার আদর ও উপহার গ্রহণ করিতেন। সাধারণতঃ আমার স্ত্রী আমার সহিত খুব অল্প কথা কহিতেন। যেখানে হাঁ কিম্বা না বলিলে চলিত, সেখানে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিতেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, নীরুর সহিত কিম্বা আমাদের দাসীর সহিত তাঁহার ওজন-করা কথার দাঁড়ি অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িত।

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে, শয়ন-কক্ষে ইজি-চেয়ারের উপর শুইয়া ভাবিতেছি—আমার হাত হইতে ইতিপূর্ব্বে-পঠিত সংবাদ-পত্রখানা বাতাসে উড়িয়া মেজের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। খোলা জানালা দিয়া শীতের বাতাস শরীরে একটা স্নিগ্ধতা আনিয়া দিতেছিল। এমন সময় মৃদু পদসঞ্চারে কমলা গৃহে প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর পাণের ডিবে রাখিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। আমি

তাহাকে টানিয়া আমার পাশে বসাইলাম। তাহার সুবাসিত কেশগুচ্ছ নাড়িয়া দিয়া, একটু আদরের স্বরে বলিলাম, "তুমি বড় নিষ্ঠুর!"

কমলা কথা কহিল না, মুখ নত করিয়া কি-একটা দেখিবার ভাণ করিল। চন্দ্ররশ্মি তাহার নিটোল সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। শীতের বাতাস, জ্যোৎস্নার আলো, কমলার কেশের মৃদু গন্ধ,—সমস্তগুলা মিলিয়া আমায় কেমন বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা বলিয়া উঠিলাম, "কমলা, তুমি জান না, তোমায় আমি কত ভালবাসি! হৃদয় যদি দেখাবার হত"—সহসা চকিত হইয়া দেখি, কমলার মুখ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে! তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! সে সজোরে আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিল।

বুঝিলাম, তাহার অত্যন্ত বেদনার উপর আঘাত দিয়াছি। কিন্তু কিসে? আমার ভালবাসা কি কমলার বেদনার কারণ? সে দিন ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম, "তাই হোক্, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমা হইতে দূরে থাকিয়া যদি তুমি শান্তি পাও, আমি তাহাতে বাধা দিব না, স্বামীর অধিকার লইয়া কোন দাবী করিব না। ইহাতে যদি আমার সমস্ত জীবন দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া যায়,—তবু আমি তাহা সহ্য করিব।"

৪

এই সময় স্বদেশী আন্দোলন দেশে নব-জীবন আনয়ন করিয়াছিল। আমার লক্ষ্যহীন, কর্ম্ম-হীন জীবনে আমি নূতন পথ দেখিলাম। কার্য্য-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিলাম। সে কি মুক্তি! কি স্বাধীনতা! মনে মনে বলিলাম, "ভগবান্, তুমি আমায় মুক্তি দিয়াছ, ভালই করিয়াছ!

আমার যখন বিশেষ করিয়া কাহারও জন্য ভাবিবার নাই, তখন যেন জগতের জন্য ভাবিতে পারি। আমার ভালবাসা যেন সমস্ত সংসারকে দিতে পারি।"

সৎকার্য্যে মন দিলে কাজের অভাব হয় না। প্রথমেই আমি বরিশালের দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট মৃতপ্রায় নরনারীর সাহায্যে অগ্রসর হইলাম। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সাধ্য, নিজে এবং ছোট বড় সকল লোকের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া বুভুক্ষুদের জন্য খাদ্য-সংগ্রহে মন দিলাম। এই সময় বহু স্বেচ্ছাসেবক এবং সহৃদয় দানশীল মহাপুরুষ আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে ফিরিয়াই শুনিলাম, আমাদের জমিদারীতে জনকয়েক পাদরি-বেশধারী খৃষ্টান প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত ধান্য ক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। বাড়ীতে একদিনও বিশ্রাম না লইয়া জমিদারীতে উপস্থিত হইলাম। সে গ্রামের প্রজারা অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষিজীবী। জটিল সংসারের কুটিল রহস্যের তাহারা কোন খবরই রাখে না! একদিন সকালে আমাদের কাছারি বাড়ীতে সমস্ত প্রজাদের আহ্বান করিয়া সরল ভাষায় পরিষ্কার রূপে সকল কথা বুঝাইয়া দিলাম।

তখন স্বদেশী বক্তৃতার ধূম পল্লী গ্রামের আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। জবরদস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী সুযোগ পাইয়া বহু লোককে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া চালান দিতেছিলেন, কাজেই ইহার কয়েকদিন পরে সহসা পুলিশ ইনস্পেক্টর আসিয়া আমাকেও রাজদ্রোহিতা প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন!

সকল কথা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই

যথেষ্ট হইবে, বিচারে আমার ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল! সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাবা আপোষে মোকদ্দমা মিটাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহাতে রাজী হই নাই। অবশেষে বিচার ফল প্রকাশ হইলে তিনি হাইকোর্টে আপিল করিলেন, তাহাতেও আমি যথেষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিলাম। তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। মোকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিল। সেখানকার বিচারে পরিশ্রম বাদ দিয়া পূর্ব্ব রায়ই বাহাল রহিল। যে দিন আত্মীয়-বন্ধুগণের অশ্রু-হাহাকারের মধ্য দিয়া ভয়ানক-অপরাধে-অপরাধীর দণ্ডভূমি, সুদৃঢ় লৌহ-কবাটযুক্ত জেলখানায় চলিলাম, সে দিন আদালত-গৃহে শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব দাঁড়াইয়াছিল।

যেদিন জেলখানা হইতে বাহির হইলাম, সে দিন আমায় মহাসমারোহে অসংখ্য লোক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পনের-আনাই যে স্কুল কলেজের ছাত্র, তাহাতে অনুমানেরও আবশ্যক করে না! অনুকূল অগ্রসর হইয়া আমার গলায় এক ছড়া বেলফুলের মালা পরাইয়া দিল। চারিদিক হইতে ফুল ও খই ছড়াইয়া ভক্তেরা আমার গৌরব বৃদ্ধি করিল। প্রণাম, আলিঙ্গনের ধূম বাধিয়া গেল। গগনভেদী বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শকটারোহণে বাটী ফিরিলাম। আমার ভক্তমণ্ডলী গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা টানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি কিন্তু তাহাতে রাজী হইলাম না।

বাড়ী আসিলাম। বাবা তখন একটা মোকদ্দমার কাগজ খুঁজিতে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া কাগজ খুঁজিতে লাগিলেন! বোধ হয়, অশ্রু গোপন করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বলিল,

এই ছয় মাস রাত্রে সে বাবুকে ঘুমাইতে দেখে নাই! সমস্ত রাত ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন! পাছে আমায় উৎসাহ দেওয়া হয়, তাই বোধ হয় এ গাম্ভীর্য্যের ভাণ! মা আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন, আমার গায় মাথায় হাত বুলাইয়া ছোট ছেলেটির মত বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সংসারে মা-ই শুধু অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন!

অনেক দিন পরে আবার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকে দেখিতে পাইব! সে আমার দুরাশা! বেহারা ঘরে আলো দিয়া গেল, একখানা বই লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম। ভাল লাগিল না, রাখিয়া দিলাম। বারবার মনে হইতে লাগিল, পাষাণী! পাষাণী!

আমি সেই হৃদয়হীনার ধ্যানে দুর্ভেদ্য কারাগৃহে নিকৃষ্ট শয্যায় পড়িয়া স্বর্গ-লোকের স্বপ্ন দেখিয়াছি! হাঁ, সেই পাষাণ-প্রতিমারই ধ্যানে! সে তখন, বোধ হয়, পরম নিশ্চিন্ত মনে সখী সঙ্গে রহস্যালাপ করিয়া তাস খেলিয়া, নভেল পড়িয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছে! শুনিয়াছি, স্পর্শমণি পাথরকে সোণা করিতে পারে। কিন্তু আমার এই হৃদয়ভরা প্রেম, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, এই ছাব্বিশ বৎসরের রূপ যৌবন, কিছুই সেই হৃদয়-হীনা বালিকাকে সচেতন করিতে সক্ষম হইল না! কমলা, কমলা, তুমি জান না, তোমায় কত ভালবাসি। ভালবাসি,—তাই জোর করিয়া স্বামী-গৌরব আদায় করিতে চাহি নাই। সমস্ত সংসারটা ধূলিমলিন জীর্ণ চীরখণ্ডের মত আমার চক্ষে একান্ত অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া, পানের ডিবা হাতে কমলা পূর্ব্বের

মতই গৃহে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, কমলা কিছু কৃশ হইয়া গিয়াছে! তাহার স্বাভাবিক গৌরবর্ণে, স্বাস্থ্যের রক্তিম আভায় ঈষৎ পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইতেছিল। বোধ করি, ইতিপূর্ব্বে তাহার পীড়া হইয়া থাকিবে! আহা, সে সময় যদি আমি কাছে থাকিতাম! কমলাকে দেখিয়াই আমার বিদ্রোহী হৃদয় ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আমার সম্মান-জ্ঞান আমায় অবিচলিত রাখিয়াছিল।

কমলা টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিয়া আমার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইলাম। তাহার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। আজ কমলা তাহাতে বাধা দিল না। সে যেন একান্ত নির্ভরপূর্ণ চিত্তে আমার বুকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। মনে হইল, আজ আর যেন কোন বাধা-ব্যবধান নাই, সে যেন আজ একান্ত-ভাবে আমারই! সহসা স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বলিলাম, "কমলা, জান না, তোমায় আমি কত ভালবাসি"—বলিয়াই চকিতভাবে চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, কমলা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল না, আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল না, শুধু করুণ অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটি তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই, তোমার গভীর হৃদয়ে সন্দেহ করিয়া তোমায় অসুখী করিয়াছি।"—বলিতে বলিতে আবার সে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অতি করুণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সে বলিল, "ঈশ্বর জানেন, আমি নিজে কত কষ্ট পাইয়াছি। তোমায় অবিশ্বাস করিয়া, তোমার স্নেহে সন্দিহান হইয়া আমার সমস্ত জীবন ক্ষয়

হইয়া গিয়াছিল। জানিতাম না, পুরুষের ভালবাসা কত বিস্তৃত! আপনাকে লোকের খেলিবার পুতুল, বিলাসের উপাদান, সখের সামগ্রী মনে করিয়া শতবার ধিক্কার দিয়াছি। এই হেয় ঘৃণিত জীবন স্বহস্তে নষ্ট করিতে চাহিয়াছি। তুমি যখন অকপটে ভালবাসা ব্যক্ত করিয়াছ, তখন তোমায় ছলনাকারী প্রতারক মনে করিয়া মাটির সহিত মাটি হইয়া মিশিয়াছি। মনে করিয়াছি, আর একদিন আর একজনকেও ঠিক এমনই করিয়া ঐ কথা বলিয়াছ! ভালবাসাকে আমি সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল পুষ্করিণী মনে করিয়াছিলাম! জানিতাম না, তাহা মহাসমুদ্র! জানিতাম না, তুমি কত মহৎ! তুমি আমার দেবতা!"

কমলা,—সেই কমলা, সেই স্বল্পভাষিণী, নিয়মচারিণী, হৃদয়হীনা কমলা! আমি তাহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলাম। আমার অশ্রুধারায় কমলার কেশরাশি আর্দ্র হইয়া গেল।

ঈশ্বরের কৃপায় আজ পাষাণে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে! আমার সকল কষ্ট, সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে!

ছুটি

প্রবাসে আত্মীয়হীন মুন্‌সেফ হীরালাল মিত্র যখন পীড়িতা পত্নী ও ছয়মাসের শিশুকন্যার তত্ত্বাবধানে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইয়া উঠিতে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পিতার আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে অনেকটা মুক্তিদান করিল। পশ্চিমে বাঙ্গালী দাসী মিলে না, হিন্দুস্থানী "দাই" লইয়া কাজ চালান যে কতখানি শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার, তাহা পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। তাই রাইচরণ যখন স্বেচ্ছায় মাতৃদুগ্ধবঞ্চিতা শিশুর সেবাভার গ্রহণ করিল, তখন বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাইচরণ, ওকে তোমায় দিলুম।" মনিবের কথায় একটু হাসিয়া রাইচরণ মেয়েটিকে আপনার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

অনেক দিনের কথা—সে আজ, প্রায় বিশ বৎসর হইবে—রাই-চরণের ক্ষুদ্র কুটীরেও একদিন এমনই একটি ক্ষুদ্র বালিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। আজ সে নাই! বহু কালের পর তাহার স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় আবার নূতন করিয়া সেই পরলোকগতা দুহিতার বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিল। সে এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতা শীর্ণদেহা গৌরাঙ্গী বালিকার সহিত আপনার হৃষ্ট-পুষ্টা শ্যামাঙ্গী দুহিতার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। ইহার হাস্যে, রোদনে এবং প্রত্যেক কার্য্যে তাহার মৃতা শিশুকন্যার স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

রাইচরণের বয়স পঞ্চাশের "কোটা" ছাড়াইয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যও তেমন ভাল ছিল না ; সম্প্রতি দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার জীর্ণ দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেশে তাহার এক উপযুক্ত পুত্র ও দুই ভ্রাতা বর্ত্তমান। পত্নী ক্ষেমঙ্করী এয়োতির চিহ্ন লইয়া ইতিপূর্ব্বেই তাহার গৃহশূন্য করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল।

রাইচরণ এই ক্ষুদ্র শিশুকন্যাটিকে এমনই স্নেহে পালন করিতে আরম্ভ করিল যে, সম্ভবতঃ বালিকার প্রসূতিও ইহার অধিক স্নেহ-যত্ন করিতে পারিতেন না। পা ছড়াইয়া বসিয়া ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান করান হইতে তাহার ছোট-খাটো সমস্ত কার্য্যই সে অতি যত্ন ও নিপুণ-তার সহিত সম্পন্ন করিত ; কখনও কোলে লইয়া দোলাইতে দোলাইতে, কখনও বা বুকে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মৃদু-গুঞ্জনে ঘুমপাড়ানি গান গাহিয়া শিশুর চক্ষে সে নিদ্রা আনয়ন করিত।

সমস্ত রাত্রি বিহঙ্গ-মাতা যেমন করিয়া শাবককে পক্ষপুটের অন্তরালে ঢাকিয়া রাখে, তেমনই করিয়া সে এই শিশুটিকে আপনার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। মেয়েটিও ভারী শান্ত, কাঁদিতে জানেই না। রাইচরণ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল, 'লক্ষ্মী।' পিতা মাতা আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন, "স্নেহলতা।" কিন্তু পাছে রাইচরণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই সে নামে কেহই তাহাকে ডাকিতেন না। বালিকার 'লক্ষ্মী' নামই বাহাল রহিয়া গেল।

দুই বৎসর রোগ ভোগের পর গৃহিণী যখন সুস্থ দেহে কন্যার পালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন সহসা রাইচরণের মনে হইল, তাহার জীবনের সমস্ত কার্য্য ও কর্ত্তব্য যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

বালিকার সঙ্গ ও সেবায় সে এমন নিবিড়ভাবে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার তাহার সাধ্য বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। দুই বৎসর পরে আবার নূতন করিয়া বিস্মৃতপ্রায় গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করা তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ও একান্ত অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হইল। এক কাজ করিতে গিয়া সে অন্য কাজ করিয়া ফেলে। কর্ত্তার জন্য চা তৈয়ার করিতে গিয়া সে দেখে, লক্ষ্মীর জন্য দুধ লইয়া আসিয়াছে! বাজার করিতে গিয়া দেখিত, মাঠাকুরাণী যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া সে নিরস্ত হইত। গৃহিণী যদি কোন দিন রাগ করিয়া বলিতেন, "রাইচরণ, তুমি দিন দিন যেন কি হচ্চ?" রাইচরণ বিরক্ত হইত না, নতশিরে অল্প হাসিয়া বলিত, "আর মা! বুড় হলুম, চোদ্দ—পনেরো গণ্ডা বয়স হল, আর কি শরীরে ক্ষমতা আছে, না মনেই কিছু সেঁধোয়। যম এখন ডেকে নিলেই হয়, আমি ত পারের ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছি।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল ইহাই যে, লক্ষ্মীর কোন কার্য্যে তাহার এতটুকু শ্রান্তি বা ভ্রম দেখা যাইত না। সংসারের কার্য্যের অন্তরালে অবসর কালটুকু লক্ষ্মীকে লইয়া খেলা করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল—ইহাতেই সে সুখ পাইত। বালিকা লক্ষ্মীও মাতৃ-হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলে ছুটিয়া গিয়া রাইচরণের নিরাপদ ক্রোড়ে আশ্রয় লইত। তাহাকে দুগ্ধ পান করানো, পোষাক পরানো, এবং রাত্রে ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি কাজ রাইচরণ না হইলে কোন মতেই সম্পন্ন হইত না। রাইচরণকে লক্ষ্মী "চন্নদা" বলিয়া ডাকিত—এ ডাক তাহাকে কেহই শিখাইয়া দেয় নাই। ইহাতে

তাঁহার পিতা-মাতা বিস্মিত না হইলেও রাইচরণ কিন্তু ইহাতে প্রজ্ঞাবতী বালিকার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে রাইচরণের বিস্ময়ের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া লক্ষ্মী যখন পিতাকে "বাবা", মাতাকে "মা" ও আহার্য্য দ্রব্যকে "হাম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শিখিল এবং হিন্দুস্থানী চাকরদের অনুকরণে নানারূপ ভাষা ও ক্রীড়ায় পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিল, তখন রাইচরণ বালিকার জীবনের আশায় এক প্রকার হতাশ হইয়াই পড়িল।

শিশু লক্ষ্মীর পালন-ভার গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরের অধিক কাল সে দেশে যায় নাই। দেশ হইতে অনেক বার অনেক পত্র আসিয়াছে। পুত্র শ্যামাচরণ "কর্ম্মে জবাব" দিয়া বাড়ী যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাইতেছে। উপযুক্ত সন্তান থাকিতে "বিদেশ বিভূঁয়ে" "খোট্টার মুল্লুকে" চিরজীবন দাসত্ব করিবার যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহা জানাইতে সে এতটুকু ত্রুটি করে নাই। রাইচরণ প্রতি পত্রেই কর্ম্মত্যাগ-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছে, বাবুকে বলিয়া কহিয়া শীঘ্রই সে দেশে যাইবার জন্য কিছুদিনের "ছুটি" মঞ্জুর করিয়া লইবে।

কিন্তু মনিবকে ছুটির জন্য জানাইবার কোন উৎসাহই তাহার দেখা গেল না। কি জানি, দরখাস্ত করিলেই যদি তাহা মঞ্জুর হয়! তখন সে কেমন করিয়া লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকিবে? তাহার অনুপস্থিতিতে, না জানি, বালিকার কত অসুবিধা, কত কষ্ট হইবে! সেই ছোট মেয়েটি যে অচ্ছেদ্য মায়া-জালে তাহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, সে জাল ছিন্ন করা বা তাহা হইতে মুক্ত হইবার তাহার কোন আশা ছিল না, সাধ্যও ছিল না।

সেবার বহুদিনের পর দেশে গিয়াও রাইচরণ পনেরো দিনের অধিক থাকিতে পারে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "মুনিব ছাড়েন না।" কিন্তু বাস্তবিক মনিব ছাড়িলেও, তাহার ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য ছিল না। এদিকে বয়সের সহিত তাহার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

২

বাবু বলিলেন, "রাইচরণ, তোমার শরীর দিন দিন যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, দিন কতক না হয় বাড়ি থেকে ঘুরে এস—আমি তোমায় ছুটি দিচ্ছি।" মনিবের কথায় রাইচরণ নতশিরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেও তাহার মুখে সন্তোষের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেল না। বাবু চলিয়া গেলে, রাইচরণ আপনার চক্ষু দুইটাকে বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া তাড়াতাড়ি মার্জ্জনা করিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী এখন বড় হইয়াছে—রাইচরণকে আর তাহার কোন কার্য্যই করিতে হয় না। বরং লক্ষ্মীই এখন রাইচরণের তত্ত্ব লয়। তাহার আহারের সময় আপনি গিয়া কাছে বসে, এবং "চন্নদা"র একখানা মাছ কেন বলিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। দুপুর বেলা আহারান্তে "চন্নদা"র পাকা চুল তুলিতে গিয়া তাহার কেশ-বিরল মস্তকটি একেবারে কেশশূন্য করিয়া ফেলা লক্ষ্মীর একটা প্রধান ও নিত্য কার্য্যের সামিল ছিল। দালানে ঈষৎ-শীতোষ্ণ রৌদ্রে মাদুর বিছাইয়া তন্দ্রাজড়িত অর্দ্ধমুদিত নেত্রে রাইচরণ তাহাদের দেশের কথা, নাতি ক্ষেতু ও নাতিনী মেণুর কথা ও আরও অনেক সামান্য-অসামান্য বিষয়ের গল্প করিত, আর এই মুগ্ধা বিশ্বস্তহৃদয়া প্রবাসিনী বালিকা পরম আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিত। কল্পনায় সেই

গোময়লিপ্ত আলিপনা-চিত্রিত মৃৎ-কুটীরগুলি, শরিষা ফুলের হরিৎ ক্ষেত্র, কমল-কুমুদ পরিপূর্ণ পুকুরের জলে ছোট ছেলে-মেয়েদের সন্তরণ কৌশলের অলৌকিক কাহিনী এবং পল্লীবাসিনী বালিকা ও বধূদের কথা চিন্তা করিয়া সে পরম আনন্দ উপভোগ করিত। সেই একই গল্প, একই কথার আলোচনা প্রতিদিন চলিত, তথাপি এই বৃদ্ধ বক্তা ও বালিকা শ্রোত্রীর তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি বা শ্রান্তি ছিল না।

ছুটি পাইলেও আজ কাল করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছিল, অথচ রাইচরণের দেশে যাইবার কোন আগ্রহ বা আয়োজন দেখা গেল না। বাবুর খানসামা নফর বলিল, "সর্দ্দারদা, বাবু যে তোমায় ছুটি দিলেন, তা দেশে গেলে না?" কথাটায় রাগের কোন কারণ ছিল না,—কিন্তু রাইচরণ রাগ প্রকাশ করিয়া বলিল, মনিব ভাল, তাই ছুটি দিয়াছেন। কিন্তু সে নিমক খায়, অপরের মত মনিবের সুবিধা-অসুবিধা না দেখিয়া আপনার গরজ বুঝিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে বাবুর পীড়ার সময় নফর বাটী গিয়াছিল।

* * * * *

অবশেষে রাইচরণ যখন দেশে যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিল, তখন সহসা লক্ষ্মী আসিয়া সজল চক্ষে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, "চরণদা, তুমি নাকি দেশে যাবে?" রাইচরণের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, গলাটা ধরিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি যথাসাধ্য আপনাকে সংযত করিয়া সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, দিদি! এবার আমায় যেতেই হবে।"

লক্ষ্মী মুখ ম্লান করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না চন্নদা, তা হবে না,

তুমি দেশে যেতে পাবে না।" কথাটা রাইচরণের খুব মনোগত হইলেও সে সহসা কঠিনভাবে উত্তর দিল, "না দিদি, এবার আমায় যেতেই হবে, বাবু আমায় ছুটি দিয়েছেন যে!" কথাটা এমন স্বরে উচ্চারিত হইল যে, বাবু যেন তাহাকে ছুটি দিয়া নিতান্ত বাধ্য করিয়াই দেশে পাঠাইতেছেন, নচেৎ তাহার যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। পিতার পক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করা বালিকার স্বভাববিরুদ্ধ, তাই সে করুণ আবেদনের ভাবে বলিল, "শীগ্‌গির তোমায় ফিরে আসতে হবে, কিন্তু। আস্‌বে চন্নদা,—বল, বল, বল?"

রাইচরণ অশ্রু মুছিয়া সম্মতি জানাইলে তাহার অঞ্চলের মধ্য হইতে গুটিকয়েক কাচের পুতুল বাহির করিয়া লক্ষ্মী বলিল, "চন্নদা, এগুলি তুমি বাড়ী নিয়ে যেয়ো, ক্ষেতুকে আর মিনিকে দিয়ো।" লক্ষ্মীর স্নেহের দান প্রত্যাখ্যান করিবে, রাইচরণের এমন সাধ্য ছিল না। লক্ষ্মীর অদর্শন কালে তাহার এই সব স্নেহপূর্ণ ছোট-খাটো স্মৃতিচিহ্নই আনন্দের সম্বল হইবে ভাবিয়া সাদরে ও সাগ্রহে সে তাহা গ্রহণ করিল।

৩

পরদিন হঠাৎ গলা ফুলিয়া লক্ষ্মীর জ্বর দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক, বিউবনিক প্লেগ!" সে সময় পাটনায় প্লেগরূপে মৃত্যুর জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন শত শত লোক মৃত্যু-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতেছিল। কত লোক ভয়ে দেশ ছাড়িয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কে কাহার খবর লয়? পলাতকের ছুটাছুটি এবং দেশব্যাপী আর্ত্তনাদ-হাহাকার ছাড়া আর কিছু নাই! মুনসেফ বাবুও স্ত্রী কন্যাকে

দেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় মৃত্যুর দূত সাংঘাতিক রোগ রূপে অসিয়া লক্ষ্মীকে আহ্বান জানাইল। ব্যাপার দেখিয়া ভৃত্যবর্গ কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ছুটি-প্রাপ্ত রাইচরণের আর দেশে যাওয়া ঘটিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই দেশে গেল না।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "রাইচরণ, লক্ষ্মী বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যায়!" লক্ষ্মীর রোগ-যাতনা-ক্লিষ্ট মসীলিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকাতর বৃদ্ধের বুকের এক-একখানি পঞ্জর যেন খসিয়া পড়িতেছিল! তবু সান্ত্বনা দিয়া সে বলিল, "ভয় কি, মা? ভগবান্ আছেন! তাঁকে ডাক, দিদিকে আমি ধরে রাখবই।" বলিয়া সেই যন্ত্রণা-কাতর অচেতন বালিকাকে ছয় মাসের শিশুটির মতই সে আপনার উদ্বেলিত তপ্ত বক্ষে ধারণ করিল। যেন সে নিরাপদ আশ্রয় হইতে, মহাকালেরও সাধ্য নাই, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করে! ছয় দিন, ছয় রাত্রি, অনাহারে বিনিদ্র নেত্রে সে মৃত্যুর সহিত অক্লান্ত যুদ্ধ করিল। জরাজীর্ণ দেহে তখন যেন নব যুবকের বল আসিয়াছিল। পিতা মাতাও তেমন অক্লান্ত সেবা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ! অবশেষে স্নেহেরই জয় হইল। ভগবান্ ভক্তের আহ্বান শুনিলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নেই! আপনার মেয়ে এ যাত্রা বেঁচে গেছে। কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, এমন প্রভুভক্ত ভৃত্য আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি। এ দুশ্চিকিৎস্য রোগ শুধু সেবায় আরোগ্য হয়েছে।"

মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া রাইচরণ লক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইলেও নিজেকে অক্ষত রাখিতে পারিল না। লক্ষ্মী একটু চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেই, সে শয্যা গ্রহণ করিল। এতদিন মনের বলে সে

আপনাকে খাড়া রাখিয়াছিল, এখন আর কোন প্রয়োজন নাই—তাহার কায ফুরাইয়া গিয়াছে! তাহার স্নেহের ধন বিপন্মুক্ত, নিরাপদ!

প্রথমে সামান্য জ্বর দেখা দিল। অবশেষে তাহাই প্লেগে পরিণত হইল। দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বৃদ্ধের জীবন চব্বিশ ঘণ্টার অধিক নয়।" প্লেগ-রোগীর শুশ্রূষা যতদূর হওয়া সম্ভব, রাইচরণের জন্য তাহার কোন ত্রুটি হইল না। ডাক্তার বলিলেন, "রোগ সংক্রামক, রোগীকে হাঁসপাতালে চালান করুন।"

হীরালাল বাবু মাথা নাড়িয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "না, না, রাইচরণ তুবার আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে, ওকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাতে পারব না।" ডাক্তার বাবু আর আপত্তি করিলেন না।

জ্বরে ও যন্ত্রণায় রাইচরণ অচেতন হইয়াছিল, তাহার কিছুই বলিবার বা বুঝিবার শক্তি ছিল না। শুধু বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে সে বলিতেছিল, "দিদি, আমার ছুটি হয়ে গেছে,—বাড়ী যাই।"

অনেক রাত্রে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত রাইচরণ যখন ক্ষীণকণ্ঠে জল চাহিল, তখন ঘরে কেহই উপস্থিত ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া লঘু পদক্ষেপে কে আসিয়া তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইল। একটা স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে রাইচরণ অনুভব করিল, ঘরে কেহ আসিয়াছে! অভ্যাসের বশে ক্ষীণস্বরে সে বলিল, "কে? দিদি, এলে!" লক্ষ্মী তাহার রোগশীর্ণ শীতল কোমল হাতখানি বৃদ্ধের জ্বরতপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিয়া বলিল, "চন্নদা, আমি এসেচি! সারাদিন আমায় কেউ আসতে দেয়নি; এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে, তাই আমি চুপি চুপি পালিয়ে

এসেচি।" বালিকার স্নেহপূর্ণ বাক্যে বৃদ্ধের কোটর-প্রবিষ্ট দুই চক্ষুতলে দুইবিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অতি কষ্টে সে আপনার অবশ হস্ত বালিকার মস্তকে রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি আমার, সুখী হও, রাজরাণী হও, এখন আমার মরণে আর কোন কষ্ট নেই।" পরক্ষণেই অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ করিয়া সে চুপ করিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "চন্নদা, তুমি ঘুমিয়ে পড়, সব কষ্ট কমে যাবে, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।" রাইচরণ পাশ ফিরিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দিদি, আমি বাড়ী যাই আমার ছুটি হয়ে গেছে।"

* * * *

প্রভাতে হীরালাল বাবু যখন ডাক্তার লইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, রাস্তার লোক-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। প্রভাত-রবির স্বর্ণ-রশ্মি রাইচরণের ক্ষুদ্র কক্ষে প্রতিদিনের মতই প্রবেশ করিতে গিয়া রুদ্ধ সার্শি ভেদ করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় ইতস্তত সঞ্চারণ করিয়া ফিরিতেছিল। ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "একি,—মা লক্ষ্মী, তুমি এখানে?" লক্ষ্মী পিতার প্রতি ফিরিয়া সকরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "বাবা, চুপ কর, চন্নদা ঘুমিয়ে পড়েচে, ওকে জাগিয়ো না। কাল সারাদিন রাত ওর ঘুম হয়নি, বাবা!"

ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না মা, আর ওকে জাগাতে হবে না, ভগবান ওর সব কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। বেচারার ছুটি হয়ে গেছে।"

প্রেমের জয়

উদীয়মান স্ত্রী-কবি-মহলে শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়ের নাম খুবই প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার লেখার সুন্দর ভাব ও ভঙ্গী, ভাষার মধুর ঝঙ্কার চারিদিকে একটা কবিত্বের নিবিড়তা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল। 'সাধারণ' বলিয়া কোন জিনিষেরই তাঁহার নিকট আদর ছিল না। 'কবি' হইয়াই তিনি জন্মিয়াছিলেন, আর তাঁহার সাধ ছিল, জীবনের অপরাহ্নে মধুময় কবিত্বের স্বপ্নরাজ্যে কবিত্বপূর্ণ ভাবে দিন-শেষে-ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতই তাঁহার জীবন-পুষ্পটি একদিন সায়াহ্নের গোলাপী আলোকে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িবে।

কবির পদ যে খুবই অনায়াসলভ্য, তাহা নহে! শুধু ফুলে-ভরা, নীল কাঁটার বেড়া দেওয়া, বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধপূর্ণ ছোটখাট বাগানখানি, আর 'যন্ত্রস্থ' কবিতাপুস্তক 'হৃদয়-বেলা'র জন্যই যে তিনি কবি—তাহা নহে। ঈশ্বরদত্ত একটা বিশেষ ক্ষমতার তিনি অধিকারিণী ছিলেন। এ ক্ষমতা কিছু সকলেরই থাকে না!

নির্ম্মলা রায় ভিতর ও বাহিরের সমস্ত অশোভন কবিত্বহীন বিষয়, বস্তু ও চিন্তা হইতে নিজেকে সাবধানে সযত্নে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ছোট মেয়েটি প্রভাতের হিম-কণার মতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর। তাঁহার কোন কবি-বন্ধু একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'মিসেস রায়, আপনার রেণুই ত একটি জীবন্ত কবিতা।' কথাগুলি রেণুর মায়ের

খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে তিনি ঠিক নিজের মনের সহিত মিলাইয়া কবি-কল্পনার আদর্শের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিবেন। মেয়েকে তিনি "কবিতা—পুণ্য" আর "দরিদ্রতা—পাপ" এই শিক্ষা দিতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

গ্রীষ্মের এক নির্ম্মল প্রভাতে মিষ্টার রায়ের ছোট বাগানখানি অজস্র ফলে-ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মাধবীলতা-বিজড়িত কুঞ্জের সম্মুখে, ভ্রমরের গুঞ্জন-ধ্বনি-মুখরিত সুন্দর উপবনের মধ্যস্থলে মার্ব্বেল-মণ্ডিত বেদীর উপর কবিত্ব-পূর্ণভাবে বসিয়া রেণুর মা তাঁহার বোম্বাই-প্রবাসী সিবিলিয়ান স্বামীকে পত্র লেখা শেষ করিয়া সবেমাত্র একটি কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির আনন্দময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে কবি-চিত্ত ভাবের তন্ময়তায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। যে সকল ভাবকে কোন কবি ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া চোখের উপর প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই, এমন সব ভাব—ভাষার নবীন ঝঙ্কারে, ছন্দের মধুরতায় ছত্রের পর ছত্রে ফুটিয়া উটিতেছিল।

সহসা কবির চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া সুমধুর স্বরে ধ্বনিত হইল, "মা, অ—মা!" প্রভাত-সূর্য্যের সুবর্ণ-রশ্মি অঙ্গে মাখিয়া কবিতার জীবন্ত-প্রতিমা বালিকা রেণু ব্যগ্র দৃষ্টিতে জননীর পানে চাহিয়া, তাঁহার কবিমুখের আনন্দোচ্ছ্বসিত হাস্যে চারিদিক মধুময় করিয়া তুলিল। নির্ম্মলা হাতের লেখা হইতে চোখ ফিরাইয়া মেয়ের প্রতি চাহিলেন, "কি হয়েছে, রেণু? তুমি অত হাঁফাচ্ছ কেন?"

অত্যধিক আনন্দের আবেগে হাঁফাইতে হাঁফাইতে রেণু বলিল, "মা,—তুমি দেখনি, বাগানের ওধারে ওদের একটি খুকী হয়েচে!"

মিসেস রায় চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়, বল্লে ?"

"ঐ যে রাস্তার ও পারে, কিণু কামারের বাড়ী, না ? ঐ কিণুর বৌয়ের একটি খুকি হয়েছে, মা, আমি তাকে দেখেছি, সে ঠিক পুতুলের মত ছোট্ট, কিন্তু পুতুল নয়, মা, সে জ্যান্ত মানুষ। কিণুর বৌয়ের বিছানায় শুয়ে আছে।"

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিলেন, "ঐ নোংরা কুঁড়ে ঘরটায় একটা ছেলে হয়েছে, কি দুঃখের কথা, রেণু? আমার বোধ হয়, এতক্ষণে মেয়েটাকে তারা একবারে দমবন্ধ করে মেরে ফেলবার যোগাড় করে তুলেচে। একে ত সেই কুঁড়েটুকু, তাতে দরজা-জানালা বন্ধ রেখেছে ত ?" রেণু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা রেখেচে যদিও, কিন্তু সেজন্য তাদের কোন কষ্ট হয়নি ত, মা ! আমার বোধ হয়, মানুষে যদি কোন নূতন সুন্দর জিনিস পায়, তাহলে তাদের আর কোন কষ্টই থাকে না ! না—মা ?"

মাতাকে নির্ব্বাক দেখিয়া রেণু উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "ওদের দেখবার জন্য কিণুর দিদি এসেচে, কিনু তখন কাজে যাবার জন্যে বাইরে এসেছিল, তাকে জিজ্ঞেসা করলুম, খুকির কি নাম রাখ্‌বে ? সে বল্লে, 'গঙ্গা'। 'গঙ্গা' ভাল নাম নয়। তুমি কিণুকে বলো, মা, খুকির একটা ভাল নাম রাখ্‌তে। খুকী এখন যদিও দেখ্‌তে খুব ভাল হয়নি—কিন্তু বড় হলে হবে।"

নির্ম্মলা রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাগল মেয়ে ! ভাল নাম কি ওরা জানে ? আহা, বেচারা গঙ্গা ! তুমি কি মনে কর, সে কখনো

ভাল দেখ্‌তে হবে? ও রকম বাড়ীতে তা কি কখন কেউ হতে পারে! আমি যে একবার মেয়েটাকে দেখে আস্‌ব, তারও উপায় নেই। ওরকম অপরিষ্কার বদ্ধ ঘরে ঢুক্‌লে আমার মাথা ধরে যায়।”

নির্ম্মলা অনতিদূরবর্ত্তী দরিদ্র প্রতিবাসীর খোলার ঘরের প্রতি একবার ঘৃণা ও তাচ্ছল্যপূর্ণ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার কল্পনা সেখানে কদর্য্য অপরিচ্ছন্নতা ও দারিদ্র্যের ভীষণতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। রেণু কিন্তু তাহার দিব্য দৃষ্টিতে সেই গরীবের বদ্ধ ঘরের অভ্যন্তরস্থ মধুরতাটুকুই পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিয়াছিল।

জননীর অজস্র কবিতা ও সযত্ন চেষ্টা তাহার শিশু-হৃদয়ে যে ভাব জাগাইতে পারে নাই, আজ নবাগত নবজাত শিশুটিকে দেখিয়া, তাহার নবজীবনের আবির্ভাব দর্শন করিয়া, বালিকার চিত্তে সেই অজানিত সুমধুর সুখের তরঙ্গ খেলিতেছিল। বিপুল আনন্দের আবেগে তাহার নির্ম্মল নিটোল গণ্ড দুইটি গোলাপের আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নির্ম্মলা রায় তখন অন্য একটা ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি রেণুকে বলিলেন, “আজ বিকালে মিষ্টার বসু আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আস্‌বেন। তিনি একখানা বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি, নিজেও একজন বড় লেখক, তা ছাড়া ওঁর খুব বন্ধু। আমার ইচ্ছা, তিনি তোমায় যেন এতটুকু ময়লা না দেখেন! চাকরদের বলে দিয়েছি, ‘ওপ্যাল’কে সাবান দিয়ে বেশ্‌ করে ধুয়ে সাফ্‌ করে দেবে। বামাকে বলেচি, পূজার সময় নতুন ক্যাটালগের নমুনা দেখিয়ে তোমার

জন্য যে লম্বা সাদা শিল্কের ফ্রকটি তৈয়ার করান হয়েছিল, সেইটি তোমায় পরিয়ে দেবে। তুমি ওপ্যালের গলায় একটা চওড়া নীল রংয়ের ফিতে বেঁধে, ফিতেটি ধরে দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রয়িং রুমে এসো! যদিও ওপ্যালটা ভারী পাজী কুকুর, কিন্তু আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই তার খুব সুখ্যাতি করেন। মিঃ বসু এসে আধ ঘণ্টাটাক্ বস্‌বার পর তোমরা আস্‌বে! আমি তোমায় এমন সুন্দর দেখ্‌তে চাই,—যাতে মিঃ বসু একেবারে অবাক্ হয়ে যেতে পারেন। বুঝ্‌লে ত? সাদা পোষাকের সঙ্গে সাদা জুতাটিই পায় দিয়ো। আর তা ছাড়া একসঙ্গে তোমার আর আমার যে ফটোখানা সে দিন তোলান হয়েচে, সেখানা আমি মিঃ বসুকে দেব, মনে কচ্চি। তাহলে তোমার ছবি ওপ্যালের সঙ্গে একসঙ্গে কাগজে বেরিয়ে যাবে।"

রেণুর কানে এ সকল কথা প্রবেশ করিতেছিল কি না, বুঝা গেল না। যদিও সে মার কথা শুনিতেছিল, কিন্তু তার মন তখন সেই গরীবের ঘরের ছেঁড়া বিছানায় পড়িয়াছিল, যেখানে একটি "জীবন্ত মাণিক" সে দেখিয়াছে! বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইলেও এটুকু সে বুঝিয়াছিল যে, প্রথম সন্তানের আবির্ভাবে পিতামাতার মনে কত আনন্দ হয়! সে নিজের চোখে দেখিয়াছে, নবজাত শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বাপের অত্যন্ত 'সাধারণ' মুখেও কেমন আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর মায়ের মুখে কেমন কোমল স্নেহের হাসি, কেমন করুণ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল! বিশ্বের সমস্ত 'কবিতা', সে শোভার কাছে অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য রেণু যে ঠিক এই কথাগুলিই এমন ভাবে গুছাইয়া ভাবিয়াছিল, তাহা নহে, তবে এমনই একটা অজ্ঞাত

নবজাত মধুর ভাবে তাহার ছোট হৃদয়টি বর্ষার জলে-ভরা নদীর মতই সহসা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

রেশমের মত মেয়ের নরম চুলগুলির দিকে ঈষৎ সগর্ব্ব দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ম্মলা রায় বলিলেন, "বামা, তোমার চুলগুলি আঁচ্ড়ে পাতা কেটে সাজিয়ে দেবে। ফিতার ফুল দেওয়া তোমার সেই সাদা টুপিটা মাথায় দিয়ো।" রেণু সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া, মায়ের কোলের কাছে একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিল. সম্মুখের লেখার প্রতি একটু বাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ও কি লিখ্‌চ, মা?"

মা বলিলেন, "আমি বৃষ্টির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখ্‌চি; ভগবানের কি মহিমা! প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিত্ব ভাব, তিনি বৃষ্টির মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেচেন। গ্রীষ্মের রৌদ্র-তপ্ত ধরণীর বক্ষে যখন সহসা রৌপ্য-নির্ঝরের মত স্নিগ্ধ বৃষ্টির অশ্রু-ধারা ঝর ঝর ধারে ঝরিয়া পড়ে, তখন সে কি চমৎকার দৃশ্য, মনে কর, দেখি! আতপ-তপ্ত হরিৎ পত্র-লতা কেমন নত-শিরে পিপাসু চিত্তে সেই স্নিগ্ধ বারিধারা গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করে। তারপর মেঘ ভাঙ্গিয়া যখন সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, কখনও সতেজ, কখনও বা ছায়াম্লান,—রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ—তখন সেই শীতল ধারাগুলি, আলোকের উজ্জ্বল চুম্বনে নিমেষে কেমন করিয়া শুখাইয়া উঠে, তাহার দাগটি পর্য্যন্ত মুছিয়া যায়! আহা, সে কি সুন্দর! বৃষ্টির সকলই কবিত্ব-মাখা।"

রেণু মায়ের বর্ণনার সমস্ত বিষয় না বুঝিলেও বৃষ্টি যে খুব সুন্দর এই সহজ তত্ত্বটুকু বুঝিয়া লইয়াছিল। সে মায়ের কোলের উপর হাতের ভর রাখিয়া বলিল, "তুমি সেদিন গোলাপের জন্ম নিয়ে একটি

কবিতা লিখেছিলে, আর ওপ্যালের কথা দিয়ে কে একজন একটি লিখেছিল, আমায় পড়ে শুনিয়েছিল—আচ্ছা মা, সেই ছোট্ট খুকিটির নামে একটি কবিতা লিখে দিতে পার না? অ—মা! দেবে কি, তুমি লিখে?”

নির্ম্মলা রায় হাসিয়া মেয়ের মুখের উপর হইতে চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “না, বাছা, ওদের সম্বন্ধে আমার কবিতা আস্‌বে না। আর আমার বোধ হয়, কারুরই তা আস্‌তে পারে না।” দারিদ্র্যের মধ্যে আর কি কবিতা থাকৃবে!”

একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া রেণু মায়ের নিকট হইতে উঠিয়া গেল। সেই নূতন ছোট্ট মেয়েটিকে দেখিবার ইচ্ছা, তাহার মায়ের মনে যে কেন একবারও উদয় হইল না, ইহাই তাহার নিকট সব চেয়ে আশ্চর্য্য মনে হইল! বাগানের পথে চলিতে চলিতে সে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথাই শুধু ভাবিতে লাগিল।

২

ছবির নমুনায় প্রস্তুত পা অবধি বিস্তৃত লম্বা সাদা শিল্কের ফ্রকটি রেণুকে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। “ছবির খুকি” পরিয়াছিল বলিয়াই যে জীবন্ত বালিকাকে তেমনই গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা দেওয়া পোষাক পরাইবার কোন প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। তবে কবির ‘পছন্দ’ ও ‘খেয়াল’ কবিই বুঝেন, সাধারণের মতের সহিত তাহার কোন মিল থাকিতে পারে না! টুপিটি রেণুর ভারী পছন্দ হইয়াছিল। সেটা খুব নরম—আর মাথায় বেশ বসিয়াছিল, তা ছাড়া টুপির ফিকে নীল রঙের রেশমি ফিতার ফুলগুলি বড় সুন্দর।

সারাদিনের পর ছাড়া পাইয়া ওপ্যালও অত্যন্ত খুসী হইয়াছিল। রেণু তাহার গলায় একটা নীল ফিতা বাঁধিয়া তাহাকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছিল। ফোলান সাদা ধবধবে লম্বা লম্বা লোমগুলি, গলায় ছোট রূপার ঘণ্টা, আর ফিকে নীল রঙের ফিতার ছোট্ট 'বো'-টিতে ওপ্যালকে সত্যই যেন কাব্য-লোকের জীব বলিয়া বোধ হইতেছিল।

স্ফীত মুখে, স্নেহপূর্ণ কটাক্ষে রেণু তাহাকে দেখিতেছিল। ছোট দুখানি হাতে ওপ্যালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া রেণু বলিল, "সত্যি বল্‌চি, ওপ্যাল, সাজলে তোকে ভারী সুন্দর দেখায়!"

রেণুর আদরের প্রতিদান-স্বরূপ ওপ্যাল তাহার মুখ-লেহনের চেষ্টা করিতেছিল। এ দৃশ্যটা কবি রায়ের একান্ত অমনোনীত। ওপ্যাল যেন সমস্তই বুঝে, এমনই ভাবে রেণু বলিল, "চল্ ওপ্যাল! আমরা ততক্ষণ ঐখানে একটু বসিগে, মা ত পিয়ানো বাজাচ্চেন, আমরা আর এখানে কি কর্‌ব!"

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা ফটকের নিকট আসিল। মালতী ফুলের স্তবকে ঘেরা ফটকের উপর সম্মুখের পা দুইটা তুলিয়া ওপ্যাল হাঁফাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর বাহির হইবার ইচ্ছা হইলে সে এইরূপই করিয়া থাকে। রেণুর উৎসুক চোখের দৃষ্টি কিণুর খোলার ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ছোট কাঠের জানালাটি তখনও বন্ধ ছিল, কেবল সূতিকা-গৃহের অনতি-উচ্চ ঘুলঘুলি দিয়া অল্প নীলাভ ধূম নির্গত হইতেছিল। রেণু ওপ্যালের দিকে চাহিয়া বলিল, "চল ওপ্যাল, ওদের খুকিকে একবার দেখে আসিগে! রেণুর মনে

হইল, খুকিকে দেখিবার জন্য ওপ্যালও নিশ্চয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা ফটকের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া তাহার অত চীৎকার করিবার কারণ কি ?

ওপ্যালকে লইয়া রেণু ধীরে ধীরে কিণুর কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে দ্বারে আঘাত করিয়া আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ভিতরে যাব ?"

কিণুর বোন্ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে রেণু দেখিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একটু দম লইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে গা ? তুমি কাঁদ্চ কেন ?

"আর মা, সবই হয়েচে ! কোন্টা বল্ব,—সেই দুপুর থেকে মেয়েটার তড়্কা হচ্ছে—ভয়ে ভাবনায় বৌটা ত পাগলের মত হয়ে গেছে —ছোঁড়া সেই যে সকালে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরল না। একলা মানুষ আমি, কোন্ দিক সামলাই ? এদের একা ফেলে ডাক্তার রমেশ বাবুকে যে ডাক্‌তে যাব, তাও পাচ্ছি না। ভগবান যদিই বা গুঁড়োরত্তি-টুকু দিলেন, তা—বুঝি চিকিচ্ছে-অভাবে রাখ্‌তে পাল্লুম না।"

সহসা সর্পদষ্টের মত আড়ষ্ট হইয়া রেণু কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের স্পন্দন-ধ্বনি অত্যন্ত দ্রুত হইতেছিল। যখন সকালে সেই ছোট মেয়েটিকে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যতের কত রঙ্গিন চিত্র আশার আলোকে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে করিতে বালিকা ঘরে ফিরিয়াছিল, তখন সে কত সুখই পাইয়াছিল। আর এখন! সে নিজের সাজ, পোষাক, এমন মাতৃ-উপদেশ

এমন কি ওপ্যালকেও ভুলিয়া গেল। সে শুধু ভাবিতেছিল, সেই ছোট মেয়েটির কথা। যে তার নূতন দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর দিকে না মেলিতেই মুদিতে চলিয়াছে! আহা, বেচারা ছোট্ট গঙ্গা!

এই অতর্কিত ঘটনায় হঠাৎ রেণুর যেন অনেকখানি বয়স বাড়িয়া গেল। তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সহসা তাহাকে শিশুত্ব হইতে প্রবীণত্বে উন্নীত করিয়া তুলিল। এই অসহায় বিপন্ন পরিবারের সাহায্যের জন্য সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে! যত কঠিন কাজ হউক, সে তাহা করিবেই!

বালিকা যখন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিতেছিল, তখন বরাভয়প্রদা দেবী-প্রতিমার মতই তাহাকে মহিমময়ী মনে হইতেছিল।

রেণু বলিল, "আমি ডাক্তার বাবুর বাড়ী জানি। কতদিন সেখানে গাড়ী করে বেড়াতে গেছি। তুমি খুকীর মাকে বল, তাঁর কিছু ভয় নেই। এখনি আমি তাঁকে ডেকে আনব—রাস্তাটা দৌড়েই যাব—খুব।"

রমণী বিস্মিতভাবে বলিল, "ওমা! তাও কি হয়, বাছা? তুমি ছেলেমানুষ, এই সব দামী কাপড়-চোপড় পরে রয়েছ, সে আধ ক্রোশ রাস্তা যাওয়া, সে কি তোমার কর্ম্ম?" কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রেণু সরিয়া পড়িয়াছিল! সে তাহার কথায় কাণও দেয় নাই। তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে!

বালিকা তাহার নরম জুতা জোড়াটি পায় দিয়া যথাসাধ্য ছুটিতেছিল। ব্যাপারটা ভাল রকম না বুঝিলেও ওপ্যাল প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত ছিল

না। ওপ্যালের গলায়-বাঁধা ফিতাটা মাটিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতেছিল, রেণুর সেদিকে খেয়ালও ছিল না। দৌড়িবার সময় ধূলি উড়িয়া দৃষ্টিটাকে অবধি মাঝে মাঝে ঝাপসা করিয়া তুলিতেছিল।

সেই সূর্য্যালোকদীপ্ত নীল আকাশের পশ্চিম প্রান্তে যে একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘ বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, রেণু তাহা লক্ষ্য করে নাই। মেঘখানা খুব দ্রুত বেগে ক্ষুদ্র হইতে বৃহদাকারে পরিণত হইতেছিল। রেণুর মনে হইল, সেই নবজাত শিশুর আসন্ন বিপদের ছায়া চারিদিককার আলোকের উপর তাহার বিষণ্ণ ধূসর ম্লানিমা ছড়াইয়া দিয়াছে। সন্তানের আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা জানিতে পারিলে তাহার প্রসূতির মনে যেমন আসন্ন ঝটিকার মত বিষণ্ণ বিপন্ন ভাব জাগিয়া উঠে, বালিকার অকাল-জাগ্রত মাতৃত্বের ভাবে সেও যেন তেমনই বেদনা ও ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল।

সেই ছোট্ট মেয়েটি! সেই গরীবের ঘরের মাণিকটি! আশার আলোক! কবিত্বহীন জীবনে কবিতার উৎস! সে যে অনাদর বা ঘৃণার জিনিস নহে, তাহার বালিকা-হৃদয়ও যেন তাহা বুঝিয়াছিল।

সহসা রেণুকে তাহার দ্রুত গতিকে ঈষৎ সংযত করিতে হইল। একটা ভয়ানক শব্দের সহিত আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বিদীর্ণ করিয়া দিয়া দূরে কোথায় বজ্রপাত হইল। ভয়ে বালিকা একবার মাত্র দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া ধরিল। ভীত কম্পিত ওপ্যাল তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয়-প্রার্থী। ঝড়ে পথের ধারে বড় বড় বৃক্ষগুলা রণাহত সৈনিকের মত রাস্তার উপর নুইয়া পড়িতেছিল। পথের ধারে কঙ্কর উড়িয়া ছিটা গুলির মত গায়-মুখে বিঁধিতেছিল।

সংহারকারী ভৈরব মূর্ত্তিতে ঝড় তাহার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সমস্ত প্রলয়-শক্তিকে যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রেণুর মস্তকের উপর উদ্যত করিয়া তুলিয়াছিল! রেণু নত হইয়া ওপ্যালের গায়-মুখে হাত দিয়া আদর ও আশ্বাস দিবার ভাবে বলিল, "ওপ্যাল, ওপ্যাল, ভয় পেয়ো না, তুমি। ও শুধু মেঘের শব্দ! তুমি ত জান, আমরা যদি দেরি করি ত খুকী আর বাঁচবে না!"

কালবৈশাখীর ভীষণ ঝড়ে দেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কালো কালো মেঘগুলা প্রলয়ের জয়-পতাকার মতই উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বৃষ্টির দাপটে, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে মনে হইতেছিল, আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত। ঝড়ে পায়ের নীচের মাটি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ঝটিকা বা করকাপাত কিছুই সে ক্ষুদ্র বালিকার পথে বাধা দিতে পারিল না। প্রকৃতির এই অশান্ত বিদ্রোহ তাহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। নিঃস্বার্থ পরোপকারের চিন্তা, জীবন্ত দয়া ও মানবপ্রেম তাহাকে জগতের যাবতীয় ভয়-ভাবনার অতীত, কোন্ উর্দ্ধলোকে লইয়া গিয়াছিল। জলে-ভিজা ভারী জুতা জোড়াটার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না। ভিজা চুল ভিজা কাপড়ের অস্বস্তি অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল না। সে শুধু প্রাণপণে ছুটিতেছিল। নিষ্ঠুর পথ! তাহার বুঝি শেষ নাই। সে যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্তই সমভাবে চলিয়া গিয়াছে! ক্রমে শ্রান্ত চরণ আর চলিতে চাহে না। ভিজা কাপড়ের ভার বহিবার শক্তিও বুঝি

ফুরায়, তবু সে ছুটিতেছিল। সে তার শ্রান্ত শরীর ও ক্লান্ত মনকে কশাঘাতে ফিরাইতেছিল, "এখনও গ্রাম দেখা যায় না! তুমি চল্‌তে পাচ্ছ, কৈ? আরো ছুটে চল, ওপ্যাল, আরো জোরে চল। অনেক দেরী হয়ে গেল।"

অবশেষে পথের শেষ দেখা গেল। ডাক্তারের বাড়ীর ফটকের ভিতর, গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখে সুসজ্জিত গাড়ী ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তখন ঝড় ও জলের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন ধূসর অপরাহ্ণের ম্লান আলোকে রেণু যখন ডাক্তারের বাড়ীর বাগানের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, তখন সে এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল! দুধের মত তাহার সাদা রেশমী টুপীটি জলে ভিজিয়া ঋজু ভাবে পিঠের উপর ঝুলিতেছে। ভিজা সাদা ফ্রক্‌টি কর্দ্দমে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুবিন্যস্ত কেশরাশি জলসিক্ত হইয়া জটার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওপ্যালেরও আর সে সুন্দর শ্রী নাই, জলে কাদায় তাহাকে অত্যন্ত কদর্য্য কুশ্রী দেখাইতেছিল। পরদুঃখ-কাতরা বালিকা ও তাহার কুকুরটি উভয়েরই যে সৌন্দর্য্য-বোধ সমান ছিল, তাহা বলিবার আর আবশ্যক করে না।

রেণুর ব্যাকুল ব্যগ্র কণ্ঠের আহ্বানে ডাক্তার দত্ত নিজেই আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনি রেণুকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এই দুর্য্যোগে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে এ তোমার কি রকমের খেলা, রেণু— এস, এস, ভিতরে চলে এস!"

রেণু হাঁফাইতে হাঁফাইতে এক নিশ্বাসে ঘটনাটা বলিয়া ডাক্তারের মতামতের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া টানিয়া

তাঁহাকে গাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। ডাক্তার তাহাকে মিষ্ট কথায় বারবার আশ্বস্ত করিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার যে আর একটি রোগী রয়েছে, আমি এখনি তাকে দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম। তুমি তাদের বলগে, কোন ভয় নাই, আমি একটু পরেই যাচ্চি।"

বালিকার বড় বড় কালো চোখের ঘন পল্লব ভেদ করিয়া মুক্তার মত জলধারা তাহার গোলাপ ফুলের মত কোমল গোলাপী গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সে রোগীটিরও কি খুব বেশী অসুখ—সে কি বাঁচবে না, ডাক্তার বাবু?"

"না, তা নয়! সে ঐ বুড়ো জমিদারের মা। অনেক দিন থেকে বাতের অসুখে ভুগ্‌ছে।"

রেণু অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "সে অনেক দিন বেঁচেছে, কিন্তু খুকী? সে সবে মাত্র আজ জন্মেছে, ডাক্তার বাবু। আপনার দুটি পায় পড়ি, আগে আপনি তাকে দেখবেন, চলুন।"

বালিকার সে কাতর কণ্ঠের করুণ অনুরোধ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ডাক্তারের ছিল না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার কথাই রইল। এখন বেশ করে এই র‍্যাগটা গায় ঢাকা দিয়ে গাড়ীতে উঠে বস। ভিজে জামা-টামা ছেড়ে ফেল। তোমাদের বাড়ীতে আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব।"

রেণু ও ওপ্যালের তখন যেরূপ বাহার খুলিয়াছিল, তাহাতে সকাল বেলার সেই ছবির মত পোষাক-পরা 'পরীর মত' মেয়েটি, আর "কবিজন"-প্রশংসিত সুন্দর কুকুরটি আরব্য উপন্যাসের গল্পকথার মতই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আসিবার সময় যে দীর্ঘ পথ কিছুতেই ফুরাইতে চাহিতেছিল না, এখন তাহা অনায়াসে অতি শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। গাড়ীতে রেণু অত্যন্ত গম্ভীর বিজ্ঞভাবে ডাক্তারের সহিত 'তড়্কা' রোগ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেছিল। গঙ্গার জন্য ডাক্তার বাবুর যে একটু বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক, সে কথা বুঝাইতেও সে ত্রুটি করিল না। কারণ কিনুদের বাড়ী এই প্রথম খুকী হইয়াছে কি না! তাহারা ত এখনও ছেলের যত্ন করিতে শিখে নাই।

ডাক্তার অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া আনন্দের সহিত বালিকার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে একটা সুগভীর সুখের ভারে তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। জীবন্ত মানবের অঙ্গে অস্ত্রচালনায় অকম্পিত হৃদয়, জন্ম ও মৃত্যু দর্শনে সমভাবাপন্ন অবিচলিত শুষ্ক চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। শুধু অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র, এই সব কাজের লোকগুলা—তাঁহাদিগের জীবনে যে সঙ্গীত কখনও শুনিতে পান না—তেমনই একটা অশ্রুত মধুর রাগিণী তাঁহার বুকের ভিতরের তারগুলায় ঘা দিয়া কানের কাছে এক নূতন দেশের নূতন সুর বাজাইয়া তুলিয়াছিল। বালিকার নিঃস্বার্থ পরোপকারেচ্ছা ও মানবপ্রেম তাঁহাকে যেন নূতন আলোকে নব-জীবনে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

রেণুকে তাহাদের বাড়ীর ফটকে নামাইয়া দিয়া সস্নেহে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "কিছু ভয় নেই, বুড়ী। আমি তার জন্য আমার যথাসাধ্য যত্ন করব। তুমি খুকীর জন্যে ভেবো না। যাও, তোমার ভিজে কাপড় আগে ছেড়ে ফেলগে।"

ডাক্তারের কথার উত্তর না দিলেও, বালিকা তাহার অশ্রুসজল

কালো চোখের মৌন কৃতজ্ঞতা ভাষার চেয়েও সহজে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বাগানের পথে চলিতে চলিতে ওপ্যালকে সম্বোধন করিয়া রেণু বলিল, "আমাদের বোধ হচ্ছে, একটু দেরী হয়ে গেছে। মিঃ বসু হয় ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন। মা আমাদের দক্ষিণের বারাণ্ডা দিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন! আমরা ভিজে গেছি বটে, তা মা সে জন্য রাগ কর্‌বেন না। তিনি বৃষ্টিকে বড় ভালবাসেন, আজ সকালেই বৃষ্টির কবিতা লিখ্‌ছিলেন।"

ফিকা গোলাপী রঙের নেটের পর্দ্দা সরাইয়া যখন একটি "ছোট ছায়া" ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল—তখন মিসেস রায় মিঃ বসুকে বলিতেছিলেন, গ্রীষ্মের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য এই চকিত মধুর বৃষ্টি-পাতের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। জলে ধোয়া সবুজ মখমলের মত পাতার রং, ভিজা ঘাসের ভিজা মাটির সুমিষ্ট আর্দ্র গন্ধ, বৃষ্টিধারার" সহসা চমকিত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

গৃহ-বিস্তৃত মোটা কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া কর্দ্দমাক্ত জলসিক্ত রেণু অবসর পাইয়া সিক্ত কেশের জল ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল। আর ওপ্যাল তাহার কর্দ্দমাক্ত 'থাবা' দিয়া মিঃ বসুর ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার শুভ্র বস্ত্রে ও রেশমী কোটে চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে এই অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মুহূর্ত্তের জন্য মিসেস রায়ের চৈতন্য লুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছিল।

তারপর মায়ের পানে যখন রেণুর চোখ পড়িল, তখন সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, আজ তাহার স্নেহময়ী জননীর মনে সে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছে। অথচ তাহার কারণ, সে খুঁজিয়া পাইল না। না

পাইলেও মা যখন সেই বিরক্তির ফলে তাহাকে ও ওপ্যালকে টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তখন্ নিজেদের অনাদৃত অবস্থা বুঝিতে তাহাকে বিশেষ আরাম পাইতে হয় নাই।

শয়ন-ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বালিকা ভাবিতেছিল, মা আজ এখনও আসিল না কেন? খুকীর কথা মায়ের কাছে সমস্ত জানাইতে না পারায়, সে মনে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতেছিল। এমন সময় সিড়ীতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। উৎফুল্ল নেত্রে সে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু "মা কৈ, বামা? মা কি কচ্চেন? মিঃ বসু চলে গেছেন কি?"

দাসী বলিল, বৃষ্টির জন্য সন্ধ্যার গাড়ীতে তিনি যাইতে পারেন নাই, তাহা ছাড়া কাকাবাবু আসিয়া পড়ায় না খাওয়াইয়া যাইতে দিলেন না। তাঁরা দক্ষিণের বারান্দায় সকলে খাওয়া-দাওয়া করিলেন। দাসী রেণুর চুল আঁচড়াইয়া একটা ছোট খোঁপা বাঁধিয়া দিল। রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কিনুদের বাড়ী গেছ্‌লে কি? খুকি কেমন আছে?"

বামা বলিল, "বেশ ভাল আছে। বৌটিও বেশ্ কথা-টথা কইচে, কিন্তু ডাক্তার বাবু যদি ঠিক্ সময়ে এসে না পৌছুতেন, তাহলে এতক্ষণে সব শেষ হয়ে যেত,—কি সাহস তোমার, দিদিমণি! ডাক্তার বাবু তোমার কথা বল্‌তে বল্‌তে প্রায় কেঁদেই ফেল্লেন। মাগো, এই দুর্য্যগে,—মা আমাদের কতই বকবেন।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রেণু বলিল, "সবই ভাল হল, কিন্তু মা যে—কেন দুঃখিত হলেন! সত্যি বল্‌চি, বামা! খুকি বেঁচে গেছে, বলে আমার এম্‌নি আহ্লাদ হচ্ছে। বাবা বলেন, ভগবান আমাদের

সকল সময়েই ভালবাসেন, খুকি অত ছোট, তবু তাকে তিনি ভাল বাস্‌চেন।"

খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া রেণু বলিল, "বামা, ঐ শাদা 'লিলি'গুলি কি সুন্দর, বল দেখি! এক একটা গাছ আমার চেয়েও বড়। আজ সকালে রঘুয়া আমার পড়বার ঘরে একগাদা ফুল দিয়ে এসেছিল। মা বল্লেন, ছোট ছোট ছেলেদের মন ভাল করবার জন্য ফুল খুব দরকারী জিনিষ।"

কবিত্ব-বিহীনা বামা রেণুকে বিছানায় শোয়াইয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। "বড় মানুষদের সকলি আশ্চর্য্যি, ফুলে নাকি আবার মানুষকে ভাল করে!" সিঁড়ীতে পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেলে, রেণু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বামা আঁট করিয়া চুলগুলা জড়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। একটা ঝটকা টানে সে তাহা খুলিয়া ফেলিল। মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া আর্দ্র বায়ু সদ্য-ফোটা লিলির গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল, তাহাতে বালিকার মনে একটা নূতন 'খেয়াল' জাগিয়া উঠিল। সে নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া ফুলদানি হইতে মালির আনীত লিলির গুচ্ছটা লইয়া ঘোরান সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শয়নের জন্য বামা তাহাকে একটা সাদাসিধা হাতকাটা সেমিজ পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল মাত্র। অনাবৃত শুভ্র কোমল বাহুদুটিতে সোনার প্লেন বালা দুই গাছি, অসম্বদ্ধ অসজ্জিত কালো চুলগুলি, মুখে হাতে ঘাড়ে পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

দক্ষিণের বারাণ্ডা হইতে কাকা ও মিঃ বসুর গলার আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। মায়ের মিষ্ট হাসির শব্দ রেণুর কাণে আসিয়া তাহাকে

পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। মেঘ কাটিয়া তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

গরাদে-হীন প্রশস্ত জানালার মধ্য দিয়া প্রশান্ত জ্যোৎস্না রেখাটির মতই বালিকা সহসা একেবারে মিঃ বসুর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। একটু মিষ্ট হাসির সহিত রেণু তার ফুলের 'গুচ্ছটা' মিঃ বসুর দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি ভাবলুম—আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কিছু ফুলের দরকার হবে, তা নেবেন কি আপ্নি, এগুলি ?" সেই কল্পনার অতীত ছবির মত সুন্দর দৃশ্যটাতে মিসেস রায়ের মুখে আনন্দের পূর্ণ দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। অতিথি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সেই 'পরীর' মত মেয়েটির প্রতি কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া রহিলেন। রেণুর হাত হইতে ফুলের গুচ্ছটা লইয়া তাহাকে আদর করিয়া মিঃ বসু বলিলেন, "মিসেস রায়, আপনার সমস্ত কবিতার বহিখানি আমার "বিল্বদলের" পাঠকদের জন্য নববর্ষের একটি সুন্দর 'উপহার' হবে। লিলি রাণীর কথা আমি জীবনে কখনও ভুল্তে পারব না।"

অনেক রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে অভ্যাস-মত মিসেস রায় তাঁহার ঘুমন্ত মেয়ের মুখে চুম্বন করিতে গিয়া দেখেন, সে তখনও জাগিয়া আছে। অপরাহ্ণের ঘটনাবলী মায়ের নিকট না বলিলে বালিকার কোনমতেই নিদ্রা আসিবে না। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্তা বালিকা কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা, মা, আমি কি তোমায় কষ্ট দিয়েচি ?"

"না। তা ঠিক্ নয়, কিন্তু তুমি ত জান! আমি বাধ্যতা আর পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করি।"

"মা, তুমি জান্তে না, সেই ছোট খুকিটির কি হয়েছিল!" রেণু তার

সজল সুন্দর কালো চোখের মধুর দৃষ্টি মায়ের মুখে স্থাপিত করিয়া বৈকালের ঘটনা সমস্ত বলিয়া গেল। রেণুর মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মিসেস রায়ের গণ্ড প্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। "আমার সোনার গোলাপ! আমার ছোট মাণিক! তুমি ঠিক কাজ করেচ। আমি আজ তোমার কাছে শিক্ষা পেলেম! আমি যখন কেবল বাইরের সৌন্দর্য্য আর স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেম, যাদু আমার, তুমি তখন অন্তরের মহান্ সৌন্দর্য্যের স্বাদ পেয়েছিলে। জগতের সকল শোভার চেয়ে ঐ একটি ছোট আত্মা অনেক বেশী মূল্যবান্। যে কবিত্ব আমার অন্ধ চক্ষু দেখ্‌তে পায়নি, তুমি তা অজস্র ধারে ছড়াচ্ছিলে। মানব-জীবনের অত্যাশ্চর্য্য সুখদুঃখের সমাবেশের মধ্যে হয়ত একদিন ঐ ছোট মেয়েটিই আবার ফুলের মত সুন্দর, কবিতার মত মধুর হয়ে উঠ্‌তে পারে। হয়ত, তার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য একদিন সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগও পেতে পারে। ঈশ্বরকে কোটি কোটি প্রণাম করি, তিনি আমার রেণুকে শুধু কবিতা করে পাঠান নি, তাকে সত্যকার মানুষের প্রাণ দিয়েচেন। কাল সকালে আমরা দুজনে যখন খুকিকে দেখ্‌তে যাব, তার জন্য কিছু বিছানা আর জামাটামা নিয়ে যাব, কেমন?"

সারাদিনের পরিশ্রমে বালিকার ক্লান্ত চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিতেছিল। নিদ্রাজড়িত চোখে সুখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। অস্ফুট গুঞ্জন-স্বরে রেণু বলিল, "গঙ্গার একটি ভাল নাম বেছে দিয়ো, মা, বড় হলে সে খুব সুন্দর হবে—নিশ্চয়।"

ঋণ পরিশোধ

রুগ্ন বন্ধুর চিকিৎসায় প্রবোধচন্দ্র যখন আপনার সময়, স্বাস্থ্য এবং অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল, তখন যামিনীনাথ একদিন লজ্জিতভাবে বলিল, "মাপ কর, প্রবোধ, তুমি আমার জন্য আপনাকে ফেল করিতে বসিয়াছ!"

ভোরের আলো খোলা জানালা দিয়া যামিনীর রক্তহীন, বিবর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। একখানা বেতের মোড়ায় বসিয়া সদ্য-নিদ্রোত্থিত প্রবোধচন্দ্র রুগ্ন বন্ধুর জন্য খলে ঔষধ মাড়িতেছিল। বন্ধুর কথায় মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, "কিন্তু তুমি ত জানই, আমি কর্ত্তব্যটাকে বেশী বড় মনে করি।"

যামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু বৃথা পরিশ্রম, প্রবোধ! কি সুখের জন্য আমায় বাঁচাইলে!—পৃথিবীতে আমার এমন কে আছে, এমন কি আছে, যার প্রলোভনে বাঁচিতে সাধ যায়? আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।"

প্রবোধ উঠিয়া বন্ধুকে ঔষধ দিয়া বলিল, "ফের, ঐ কথা! তা যদি বল, যামিনী, তবে আমারই বা কি আছে, যার জন্য আমায় বাঁচিতে হইবে? সহায়, আত্মীয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ত আমার নাই! কিন্তু ভগবানের যখন ইহাই ইচ্ছা, তখন আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, কেমন করিয়া তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করিব? তুমি হয় ত বলিবে, আমার অর্থ

আছে ; কিন্তু তাহাই কি চিরস্থির ? অর্থ ত তোমারও ছিল, মকদ্দমায় জিত হয়, আবার ফিরিয়া পাইবে। জানই ত, প্রাতঃকাল মেঘাবৃত থাকিলেও সায়ংকাল অনেক সময় পরিষ্কার হয়।"

"বৃথা আশা, প্রবোধ, তা আর হয় না ! হাইকোর্টে আপিল করিলে কি হইত, বলা যায় না।" বলিয়া যামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

প্রবোধ যামিনীর মাথার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "যামিনী, তুমি পীড়িত ছিলে, তাই সব কথা তোমায় বলিতে সাহস করি নাই। আমি হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলাম।"

যামিনী চকিতভাবে মুখ তুলিয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিল। আশা ও আশঙ্কায় যুগপৎ তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "রায় কি বেরিয়েচে ? তা হলে আপিলেও—" যামিনী কথাটা শেষ না করিয়াই বন্ধুর পানে সাগ্রহে ফিরিয়া চাহিল।

প্রবোধ সযত্নে তাহার রুক্ষ চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তোমার জিত হয়েচে—ও কি ও!—যামিনী, তুমি কি ছেলেমানুষ হলে ? অত অধীর হয়ো না।"

আনন্দের আতিশয্যে যামিনী উঠিয়া বসিয়াছিল। প্রবোধ ধীরে ধীরে তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলে, যামিনীর দুই চক্ষে অশ্রুরাশি সঞ্চিত হইয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "প্রবোধ, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।"

যামিনী ও প্রবোধের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে খেলা, একত্র

লেখাপড়া, ও সহবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে অতি প্রগাঢ় আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। অল্পবয়সেই দুইজনে পিতৃমাতৃহীন, তাই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতিও যথেষ্ট ছিল। প্রবোধ ও যামিনী কলিকাতায় মেসে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন দুইজনে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তখন সহসা সংবাদ আসিল, যামিনীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা হরশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যামিনীর নামে নালিস আনিয়াছে। সে বলে, বিষয় তাহার পিতার, যামিনীর পিতা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাত্র। অগত্যা যামিনীকে মকদ্দমার তদ্বিরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু মকদ্দমা সহজে মিটিল না। পূর্ণ চারি বৎসর কাল যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, যামিনী একদিন শুনিল, মকদ্দমায় তাহার হার হইয়াছে। দারুণ মনঃকষ্টে তাহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। প্রবোধ খবর পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে অন্য কেহ না থাকায় যামিনীকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার চিকিৎসা ও স্বয়ং তাহার শুশ্রূষায় মন দিল। আর সেই সঙ্গে হাইকোর্টে নিজের ব্যয়ে যামিনীর মকদ্দমার আপিল করিল। আপিলের ফল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

২

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে অবস্থান করিয়া প্রবোধ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। অদূরে টেবিলের নিকট একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া যামিনী একটা ফটোগ্রাফ দেখিতেছিল। ফটোখানা প্রবোধের ভাবী পত্নী সুরবালার, পূর্ব্ব দিন মধ্যাহ্নে দুই বন্ধুতে নীরদ বাবুর কন্যা সুরবালাকে দেখিতে

গিয়া ফটোগ্রাফখানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না, প্রবোধের এইরূপই মত ছিল। কিন্তু স্থরকে দেখিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্থর সুন্দরী, বয়স্থা, তায় সুশিক্ষিতা! প্রবোধের সহিত ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একবার স্থরর দেখা-শুনা হইয়াছিল। নীরদ বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সেদিন তাঁহারই অনুরোধে দুই বন্ধুতে কন্যা দেখিতে যায়। স্থরকে দেখিয়া যামিনী মুগ্ধ হইল। পথে দুই-একটা কথা কহিয়াই প্রবোধ বুঝিল, যামিনী কিছু অন্যমনস্ক, প্রবোধের সব কথা তাহার কানে যায় নাই, যাহা গিয়াছে, তাহার অর্থও ভাল হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অল্প চেষ্টায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রবোধ বন্ধুর মনের ভাব বুঝিয়া লইল। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াই স্থরর ফটোগ্রাফখানা সে টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বাহিরে বাগানে তখন রোদ্ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। রৌদ্রকাতর-উত্তপ্ত প্রকৃতির নীরব ক্লান্তিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা কাঠ্‌ঠোকরা পুকুর-পাড়ে নোড়গাছের ঘন পত্রের ভিতর লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে পথের ধূলি ও শুষ্ক পত্র উড়িয়া মর্ম্মর-ধ্বনি তুলিতেছিল।

যামিনী বলিল, "প্রবোধ, তুমি যথার্থই ভাগ্যবান,—এমন রত্ন সকলের ভাগ্যে মিলে না।"

হস্তস্থিত সংবাদপত্রখানা বিছানায় রাখিয়া প্রবোধ বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দেখিল। তারপর ঈষৎ হাস্যের সহিত সে বলিল, "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি জহুরী ভাল নই, তাই রত্ন চিনিতে পারিলাম না।"

যামিনী মুখ নত করিয়া সহসা পরিত্যক্ত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ঐ তোমার বড় দোষ, সোজা কথাকে ভারী বাঁকাইয়া বল, আমি তোমার হেঁয়ালির অর্থ বুঝিলাম না।"

প্রবোধ সহাস্যে বলিল, "অর্থ আর কিছুই নয়, আমি সুরবালাকে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না, নীরদ বাবুকেও সে কথা লিখিয়াছি।"

যামিনীর মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রবোধ বলিল, "তুমি ত জানই, আমি বিবাহের পক্ষপাতী নই। নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে বিবাহ করিব না। তাই নীরদ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, তাঁর অমূল্য রত্নটি আমার প্রিয় বন্ধুকে দান করিয়া আমায় যেন মুক্তি দেন।"

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, বিস্মিতভাবে বলিল, "প্রবোধ, আমার ভয় হয়, সব সময় তোমার সব কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। আমার জন্য যদি তুমি—।" অত্যন্ত উদাসীনভাবে প্রবোধ বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না, যামিনী! আমার নিকট সুরও যে, ভবশঙ্করীও সে,—তুমি ত জান, রমণীর প্রতি আমার কেমন অবজ্ঞা!"

যামিনী মনে মনে বলিল, "প্রবোধ, তুমি মানুষ নও, দেবতা! জীবন দিয়াও তোমার ঋণ পরিশোধ হয় না।"

৩

প্রবোধের যত্ন ও চেষ্টায় সুরর সহিত যামিনীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রবোধ একদিন জানাইল, সে পশ্চিমে প্র্যাক্‌টিস্ করিবে, স্থির করিয়াছে। নব-বিবাহিত যামিনী সবেগে মস্তক নাড়িয়া

ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলে, প্রবোধ হাসিয়া বলিল, "বুঝিতে পার না, যামিনী,—দুইজনে একত্র থাকায় তোমার পসারের বড় ক্ষতি হইতেছে। সংসারী হইলে, একটু স্বার্থ বুঝিতে চেষ্টা কর।"

প্রবোধের কথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া যামিনী বলিল, "তুমি কি আমায় এতই নীচ মনে কর, প্রবোধ?"

বাধা দিয়া প্রবোধ বলিল, "না ভাই, আমি তামাসা কচ্ছিলাম মাত্র;—তুমি ত জান, আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, বিশেষত পশ্চিমের অবারিত মুক্ত সৌন্দর্য্য আমার বড় ভাল লাগে; আমার বহুদিনের ইচ্ছা সফল হইবে, ইহাতে আপত্তি করিও না।"

যামিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার কাছে ত কখনও জিতিতে পারিলাম না। তুমি যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই। কিন্তু কে জানে, এই স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছেদই আমাদের চির-বিচ্ছেদ কি না!"

যথাসময়ে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রবোধ পশ্চিম যাত্রা করিল। যাত্রাকালে অকৃত্রিম বেদনায় দুই বন্ধুর চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * * *

প্রায় এক বৎসরকাল প্রবোধ ভাগলপুরে আসিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে আপনার পসারের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। ভাগলপুরের মত উকিল-প্রধান দেশে বান্ধব-হীন নূতন উকিল প্রবোধের ত্বরিত উন্নতির কোন সম্ভাবনাও ছিল না। বাঙ্গালীটোলায় একখানি ছোট বাংলা ভাড়া লইয়া প্রবোধ আপনার সংসার পাতিল। সংসারে তাহার আপনার জন কেহই ছিল না। কিন্তু স্বভাবের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিল।

প্রবোধের ভাগলপুর আসিবার এক বৎসর পরে, হঠাৎ দেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইল। ভয়ে অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। প্রবোধের বাসার নিকটেই দুই-একজনের বসন্ত হওয়ায় বন্ধুবর্গ প্রবোধকে বাসা ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পলাইবার আর সময় ছিল না। সকলে সভয়ে শুনিল, প্রবোধের প্রতি 'মার অনুগ্রহ' হইয়াছে! দুই-একজন ভদ্রলোক হাঁসপাতালে ডাক্তার সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। দাসী-চাকর ভয়ে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার সাহেব যখন রোগী দেখিতে আসিলেন, তখন জনহীন অট্টালিকার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দারুণ যন্ত্রণায় হতচেতন প্রবোধচন্দ্রের যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ থাকিয়া থাকিয়া স্তব্ধ অট্টালিকার ইষ্টক প্রাচীর ভেদ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। রোগী দেখিয়া সাহেব হাল ছাড়িয়া দিলেন; তখন রোগীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব। এমন সময় একজন নবাগত ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রবোধের জীবন-দানের জন্য তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিল। সাহেব অতিমাত্র বিস্ময়ে তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি প্রবোধের কে হন! আগন্তুক অশ্রু মুছিয়া জানাইল, কেহ নহে, শুধু প্রবোধের নিকট সে ঋণী।

৪

"ডাক্তার সাহেব, আপনাকে শত ধন্যবাদ! আপনার কৃপায় আবার আমি সংসারের সুখ, সূর্য্যের আলো, স্বদেশের মুখ দেখিতে পাইব; আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, বাবু, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কিছু করি নাই।

ধন্যবাদ দিন্ তাঁহাকে—যিনি নিজের জীবন দিয়া আপনাকে বাঁচাইয়াছেন।"

শীতের অকাল-সন্ধ্যা চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছিল। দূরে বুড়ানাথের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দের সহিত ধূপধূনার গন্ধমিশ্রিত বায়ু দেবতার সন্ধ্যারতির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছিল। একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে চেয়ারে বসিয়া ডাক্তার সাহেব প্রবোধচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ডাক্তার সাহেবের কথায় অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রবোধ বলিল, "বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি আমার কোন বন্ধুর কথা বলিতেছেন?"

সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা! আপনি তখন অজ্ঞান ছিলেন। আমি যে দিন মনুষ্যহীন অট্টালিকায় নির্ব্বাণপ্রায় জীবন-দীপ আপনাকে প্রথম দেখিলাম, সে দিন কল্পনাতেও আজিকার কথা মনে আনিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার সেই আত্মীয়ের অক্লান্ত শুশ্রূষায়, অপরিমিত সেবায়, অদম্য উৎসাহে আপনি মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।"

প্রবোধের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার রক্তহীন বিবর্ণ মুখে ঈষৎ রক্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। সে আগ্রহের সহিত বলিল, "আমার আত্মীয়! পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, আপনার জীবনের উপর মমতাহীন হইয়া এই বিদেশে সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষা করিবে?"

প্রবোধের মনে পড়িল, অচেতন অবস্থায় সে-ও যেন কাহার স্নেহ-হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে! কাহার বিনিদ্র নত নেত্রের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি সারারাত্রি তাহার সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চাহিয়া

থাকিত! রোগের উপশমে প্রবোধ মনে করিত, সে বুঝি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে! তাহার নিস্তেজ মনোবৃত্তি, লুপ্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে সজাগ হইতেছিল। উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "তিনি কোথায়? আমার সেই জীবনদাতা, অসময়ের পরম বন্ধু—? আমি কি তাঁহার কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিব না?"

খোলা জানালা দিয়া হিমাচ্ছন্ন দূর-প্রসারিত বহিঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিতে উঠিতে সাহেব বলিলেন, "না বাবু, তিনি এখন কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অনেক উর্দ্ধে! কাল রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আপনারই সংক্রামক রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, স্বদেশে তাঁহার স্ত্রীপুত্র আছে, আপনি তাঁহাদের সংবাদ লইবেন।"

প্রবোধের রক্তহীন মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া আসিল। তাহার মনে হইল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বুঝি-বা বন্ধ হইয়া যায়! সমস্ত বিশ্বসংসার মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার চক্ষুর উপর কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সচেতন রাখিয়া সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তাঁহার নাম? আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, —তাঁহার নাম?"

সাহেব দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়াছিলেন, ফিরিয়া পকেট হইতে নোট বহি বাহির করিয়া সন্ধ্যার অল্প আলোকে সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "যামিনীনাথ মুখোপাধ্যায়।"

একটা অস্ফুট চীৎকারের সহিত প্রবোধের চেতনা-হীন দেহ শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ফাঁসি

সে দিন রবিবার। সপ্তাহের পর ছুটি পাইয়া বন্ধুবর করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। করালী আমার সহপাঠী। "কায়েতের পাতা-চাপা কপাল", এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা দেখাইতেই যেন সে এখন ওকালতীতে যথেষ্ট পসার-প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে সেদিন যখন তাহাকে পাওয়া গেল, তখন সে একা নিঃসঙ্গই ছিল। বন্ধু অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। নানা গল্প চলিল, অবশ্য বেশীর ভাগই মক্কেল সম্বন্ধে। উকিলের নিকট মক্কেলের কথা মধুভাণ্ডের মতই মিষ্ট-রসাত্মক!

করালীর বসিবার ঘরখানি বেশ সাজান। সে নিজে বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ফ্যাসনেব্‌ল্ লোক! অথচ প্রায় বৎসর খানেক হইতে একটা শুষ্ক গোলাপের কয়েকটা ঝরা পাপ্‌ড়ী পিনে-আঁটা, একখানা ছবির মাথায় আট্‌কান রহিয়াছে, ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই!

বৎসর খানেক পূর্ব্বে লীলার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া আমি ঐ শুষ্ক ফুলটি ঐখানেই দেখিয়া গিয়াছিলাম, তখন তার পাপ্‌ড়ীগুলি ঝরিয়া পড়ে নাই। ফুলটি ঝরিয়া পড়ায় পাপড়ীগুলি এখন পিনে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। আশ্চর্য্য! করালীকে আমি আইন-কীট্ বলিয়াই জানিতাম। তাহার এত সখ্! সে দিন খালি ঘর পাইয়া তাহাকে

চাপিয়া ধরিলাম, "এ গোলাপ ফুলটার প্রতি তোমার বিশেষ যত্ন দেখে মনে হচ্ছে, এর একটা বুঝি ইতিহাস আছে! কি, বল ?"

করালী প্রথমটা বিস্মিত নেত্রে, আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। তারপর অল্প হাসিয়া, পুনরায় গম্ভীর হইয়া সে বলিল, "ঠিক ধরেছ হে সতীশ! এ একটা একটা ভারী শোচনীয় ব্যাপারের করুণ স্মৃতি! বল্‌তে আর বাধা কি থাকতে পারে ? শোন।"

করালী তাহার অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের অগ্রভাগ ঝাড়িয়া চশমাখানা নাকের উপর হইতে খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তারপর সে বলিতে আরম্ভ করিল—"সেদিন—যখনকার ঘটনা আমি বলিতেছি, তখন বাহিরের কোলাহল অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। জেলখানার লৌহগরাদের ভিতর দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল। আমার মক্কেল রমজান্ তার হাঁটুর উপর কনুয়ের ভর দিয়া গালে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সূর্য্যের লাল আলো তার রুক্ষ চুলের উপর খেলা করিতেছিল।

আমি যখন তার কাছ হইতে ফিরিয়া আসি, তখন হঠাৎ মাথা তুলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব, আমি আমার স্ত্রী মুন্নাকে যদি একখানা চিঠি লিখি, তাহলে কি সে পেতে পারে ?" ফাঁসির আসামী! তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের এ সুযোগ তাহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। আমি তাহাকে কাগজ ও পেনসিল আনাইয়া দিলাম। সে একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হাতেই ফেরৎ দিল, কহিল, 'বাবু সাহেব, দয়া করে এই চিঠিখানি আমার স্ত্রীকে একশো সতের নম্বর হাড়কাটা গলির বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন, বল্‌বেন—

যদি বড় অভাব পড়ে, তাহলে যেন সে করিমকে তা জানায়, আর—আর আমার সেই ছোট সোরাব—সে যেন কখনও চুরি না করে! তাকে যেন সে সর্ব্বদা মনে করিয়ে দেয় যে, তার বাপ শুধু চুরি করতে শিখেছিল বলেই ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে! আর মুন্না জানে, দেওয়ালের গায় পেরেকে ন্যাক্‌ড়াবাঁধা একটি কাঠের কৌটাতে একটি গোলাপ ফুল আছে—সেটি যেন সে যত্ন করে তুলে রাখে। সোরাব যখন বড় হবে, তাকে সেইটি দেবে, বলবে, সেটি দেবতার দান। তিনি নিজে এসে বলেছিলেন, পাপের পথে আর যাস্‌নি। তা যদি শুন্‌তেম! যাক্—সে কথা আর কেন? সোরাব যেন পাপ না করে, পাপের শাস্তি পেতেই হয়, আর সে শাস্তি বড় ভীষণ!"

রমজান আমায় সেলাম জানাইয়া চুপ করিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, পৃথিবীর সহিত তাহার সমস্ত দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া সে যেন এখন মহাযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বাহিরে গোলমাল থামিয়া গিয়াছিল। সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকুও দূরে মেঘান্তরালে মিলাইয়া আসিয়াছিল। ভারাক্রান্ত মনে আমি ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কথায়, তাহার ভাবে, তাহার চক্ষুর দৃষ্টিতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে দোষী নয়। তবু কোন উপায় নাই—আইনের চক্ষে সে অপরাধী—কোন মতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারা গেল না।

পরদিন আইনের আদেশ যথারীতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়া গেলে আমি সেই মৃত আত্মার অন্তিম অনুরোধ-পালনের জন্য তার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। সে এক নরকের দ্বিতীয় সংস্করণ, সেই জায়গাটা। খানিক ডাকাডাকির পর এক বৃদ্ধ আসিয়া দ্বার খুলিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?" আমার উদ্দেশ্য জানাইলে সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "সে সব চুকে বুকে গেছে, মশাই—তাকে আর চিঠি দিতে হবে না। রমজানের ফাঁসি হয়ে গেছে শুনেই কাল রাত্রে ছুঁড়ী আফিং খেয়ে মরেচে। এই কতক্ষণ পুলিশের লোক এসে লাস নিয়ে গেল।"

"আর ছেলেটী ?"

"তাকে তার বন্ধু করিম সেখ আজ কদিন কোথায় নিয়ে গেছে—ছেলেটাকে আগে থাকতেই সরিয়েছিল, বলে—পরের বাড়ী দাসীগিরি করতে হবে, ছেলেশুদ্ধু লোক রাখ্‌বে কেন? মাগী কি কম সেয়ানা! করিমের হাতে-পায় ধরে ছেলে গছিয়ে দিলে, বলে, ওকে নিজের ছেলে মনে করে মানুষ করো—সে কি যেতে চায়! কি কান্না, ছেলেটার! মাগী এত বড় সয়তানী,—অনায়াসে আফিং খেয়ে মল, আবার ঘরে একটা বন্দুক পড়েছিল, তারই জোড়াটা দিয়ে ওর স্বামী মানুষ খুন করেচে—পুলিশ এসে আবার হাঙ্গামা সুরু করেছিল—বন্দুকটা করিমের। কোথায় বুঝি দাঙ্গা করে এনেছিল, কাণের খানিকটা কেটে গেছে, দেখলেম—আগে কই কাণকাটা ছিল না ত। যাক্, সে সব আপদ চুকে গেছে! কেই বা করিমকে চেনে, কোথাই বা তার ঘর!" বৃদ্ধের বক্তৃতায় বাধা দিয়া আমি একবার আমার মক্কেলের ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইয়া দেওয়ালের উপর হইতে ন্যাকড়া-বাঁধা কৌটা-সমেত শুষ্ক ফুলটি লইয়া আসিলাম। ইচ্ছা ছিল, সোরাবের সন্ধান পাওয়া গেলে এটি তাহাকে দিব।

বাহিরের খোলা হাওয়ায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম। চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। ব্যাপার আমার সবই মনে আছে, তবু তুমি

পড়িয়া দেখ।" করালী তার ডেস্ক খুলিয়া একখানা আঁকা-বাঁকা অক্ষরে যথেষ্ট বানান-ভুল ও কাট্‌কুট্‌-করা চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। চিঠিখানা এই,—

"করিম!

আমার কথা রাখ! চুরি ছেড়ে দাও। চুরি-ডাকাতিতে পেট ত ভরেই না, শুধু দুঃখ-কষ্ট-ভোগ আর নিজেকে শেয়াল-কুকুরেরও অধম করে ফেলা হয়। একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চুরি আর কর্‌ব না। তা যদি পারতাম! আমার মত চোর-ডাকাতে কখনও প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারে?

মনে পড়ে, ছেলেবেলাকার কথা! তখনকার সব সুখের দিন মনে পড়ে। কে জান্‌ত, অধম আমার জন্যে ফাঁসিকাঠ অপেক্ষা করছিল। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে যাওয়ায়, কুসঙ্গে মিশে পাকা বদমায়েস হয়ে উঠ্‌লেম। তখন থেকেই তুমি আমার সঙ্গী, আমার সবই তুমি জান। কেবল জান না, আজ তোমায় যা বল্‌ব। তুমি শুনেছ, আমার ফাঁসি হয়ে গেছে। কারণ এ চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন আর আমি এখানকার বিচারালয়ে এখানকার বিচারকের কাছে থাক্‌ব না, তখন অন্য বিচারক আমার বিচার কর্‌বেন। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি বাস্তবিকই খুনে নই! তাহলে সব কথা বলি, শোন।

একদিন—সে প্রায় ছ'মাসের কথা, আমি সে দিন রাস্তায় একটা গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখছি, আর কেমন করে অসাবধানী পথিকের পকেট থেকে ঘড়ি বা টাকা-পয়সা তুলে নেওয়া যায়, তারই ফন্দী ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখলাম, একটা ঘোড়া রাস্‌-টাস্‌ ছিঁড়ে পাগলের মত ছুটেছে। আমি লাফিয়ে তার

সামনে পড়লাম, আর তার লাগামটা খুব জোর করে ধরে ফেললাম।

ঘোড়াটা এই রকমে হঠাৎ বাধা পেয়ে, বোধ হয়, আশ্চর্য্য হয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু যে সব লোহার সাজ তার গলায় ঝুলছিল, তারই একটা কি সজোরে সে-সময় আমার মাথায় লেগে গেল—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হল, বেশ বুঝতে পারলাম, আমি একখানা গাড়ীর ভিতর ঠেসান দিয়ে বসে আছি, আর আমার ঠিক সাম্‌নে বসে একটি পরীর মত মেয়ে—রুমাল ভিজিয়ে আমার ক্ষতের রক্ত ধুয়ে দিচ্চেন। আমায় চোখ চাইতে দেখে তিনি বল্লেন, আমায় তারা হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমি ভাল আছি। হাঁসপাতালে আমি কোন মতেই যেতে রাজী হলাম না। তিনি আমার বাড়ীর ঠিকানা জানতে চাইলেন, তোমার কাছে সত্য বল্‌চি, তাঁকে ঠিকানা বল্লেম। তিনি আমার আরোগ্য কামনা করলেন, বার বার ধন্যবাদ দিলেন। আমার মত পাপীর জীবনের জন্যও ঈশ্বরের করুণা চাওয়া!

আমার বাড়ীতে এনে তার লোকজনের সাহায্যে তিনি আমায় বিছানা করিয়ে শুইয়ে দিলেন, আর যাবার সময় মুন্নার হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়ে গেলেন। তারপর যতদিন না আমি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলেম, তিনি রোজ এসে আমায় দেখে যেতেন। কত ভাল কথা কইতেন, কত মিষ্টি ধর্ম্মের গল্প বল্‌তেন, তিনি! ভগবান যে আমাদের ভালবাসেন, আর গরীব বড়লোক সকলকেই যে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন, সেই সব কথা! আমার

তখন সমস্তই কেমন গোলমাল হয়ে গেছল, সমস্তই যেন নূতন রকম মনে হত! এমন আনন্দ, এমন ভাব, আমার জীবনে আর কখনও ভোগ করিনি। আমি তাঁর নাম—ঠিকানা কিছুই জানতে চাইনি, জানতেম, তিনি বড় লোকের মেয়ে, আর গরীবের উপর তাঁর বড় দয়া! আমি তাঁকে "মা" বলে ডাকতুম, তিনি মুখ টিপে লজ্জার হাসি হাসতেন। আমি তাঁর ছোট পবিত্র মুখখানির দিকে ভাল করে চাইতে পারতেম না। শেষ যেদিন তিনি আমার কাছে বিদায় নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আর তাঁর আসবার সুবিধা হবে না, সেদিন তিনি কিছু টাকা আর একটি ফুটন্ত গোলাপ ফুল দিয়ে গেছলেন। ফুলটি আমি কৌটায় করে যত্নে রেখেছিলেম, সেটি এখনও আছে। আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম, চুরী-ডাকাতি ছেড়ে দেব, মানুষের মত খেটে খাব। কাজ খুঁজতে আরম্ভ করলেম। একজন জিজ্ঞাসা কল্লে, এর আগে কোথায়— কি কাজ করেচি! আমি সত্য কথা বলেছিলেম। জেল-খালাস আসামীকে কে কাজ দেবে? আমায় কেউ কাজ দিলে না।

ক্রমে অর্দ্ধাহার, অনাহার, মুন্নার লাঞ্ছনা, শিশু সোরাবের কান্না অসহ্য হয়ে উঠল। কাজ খুঁজে-খুঁজে হায়রাণ হয়ে আমার মন তিত হয়ে উঠল। থেকে-থেকে সেই পুরানো কাজের জন্য মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জেগে উঠত! কে যেন জোর করেই আমায় সেই পথে ঠেলে দিত। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না—স্থির কল্লেম, চুরিই করব। কিছু দূরে একটা বড় বাড়ীতে চুরি করব ঠিক কল্লেম। আগে থেকেই বাড়ীটার ভিতরে কোথায় কোন ঘর—কোথায় সিঁড়ি সব জানা ছিল।

সেদিন অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়্ছিল। আমার মত হতভাগা ছাড়া তেমন রাতে কেউ বাড়ীর বার হয় না। আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল—দরজাটা ভেজানো ছিল। আনন্দে ও ভয়ে আমার মাথার ভিতর ঝিম ঝিম কচ্ছিল। যদি দোরটা খোলা না পেতেম, হয়ত মনকে বুঝিয়ে ফিরে আস্তেম, হল না। আমার ভাগ্য-দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিলে—আমি বরাবর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। সাম্নের একটা ঘরে টেবিলের উপর বাতি জ্বল্ছিল, আর নীচেই একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে একটি বার তের বছরের মেয়ে ঘুমুচ্ছিল। মেয়েটির বুকের উপর পাতা-খোলা একখানা বই পড়ে আছে! বোধ হয়, সে পড়্তে পড়্তে ঘুমিয়ে পড়েচে। তার গলায়, হাতে সোণার গহনা ঝক্ঝক্ কচ্ছিল। আঙ্গুলে একটা আংটী,—তার লাল পাথর-খানার কি জলুষ! আগুণের মত সেটা জ্বলছিল! রক্তের মত টক্টকে লাল! মেয়েটি আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলছিল। কি অঘোর ঘুম! মরা মানুষের মত! অতি সহজ কাজ—অল্প পরিশ্রম! আমি চেয়ারের পিছন থেকে তার উপর ঝুঁকে পড়্লেম। তুমি জান, আমি খুনী নই, খুন কখনও করিনি, আর কখনও কর্‌ব বলে মনে করিনি—কিন্তু তখন আমার মাথায় বোধ হয় খুনই চেপেছিল, না হলে আমি কোমর থেকে ছোরা বার করে তার বুকের উপর ধরেছিলেম, কেন? শুধু এক মুহূর্ত্ত! হঠাৎ হাওয়া লেগে আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি তার মুখ দেখতে পেলেম—আল্লা রক্ষা কর—আমি কি দেখলেম? সেই মুখ—সেই সরল, সুন্দর, পবিত্র মুখ। যে মুখের দিকে সাহস করে, ভাল করে কখনও চাইতে পারিনি—যার পায় কাঁটা ফুট্‌লেও আমি বুক পেতে

দিতে পারি—এ তার মুখ। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠল্! মনে হচ্ছিল, সমস্ত চেতনা বুঝি যায়!

কতক্ষণ এ ভাবে ছিলেম, জানি না। হঠাৎ পাশের ঘরে বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায় আমার হুঁস হল। তাড়াতাড়ি ছোরাখানা মাটিতে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। বাইরে শুনলেম, মনে হল, নীচে একটা গোঙানি শব্দ, আর দুড়-দাড় পায়ের আওয়াজ হচ্চে। পাগলের মত ছুটে নীচে এলেম—আমি যে চোর—এই পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমিই যে খুন করতে গেছলেম, সে কথা ভুলে গেলেম। আমার তখনকার অবস্থা বোঝাবার নয়। নীচে বড় হলঘরে মেঝের উপর একটি বুড়া মানুষ পড়ে আছে, বন্দুকের গুলি তার কপালের উপর দিয়ে চলে গেছে—লোকটি মরে গেছে। আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেম, নড়বার ক্ষমতা আমার তখন ছিলও না।

তারপর যা-যা হয়েছে, তা সকলেই জানে। বাড়ীর চাকর-বাকররা এসে আমায় খুনী বলে পুলিশে চালান দিলে। আমার বন্দুকের, যার যোড়াটা তোমার কাছে ছিল, একটা ঘর খালি ছিল, তা ছাড়া ডাক্তারের পরীক্ষাতেও স্থির হয়ে গেল ঐ বন্দুকের গুলিতেই মরেছে। আমি কোন কথা বলিনি। বল্‌বই বা কি? তবু আমার উকিল ঢের চেষ্টা করেছেন, এক টুক্‌রা কাটা কাণ বুড়ার কাছে পড়েছিল, তা নিয়ে অনেক তর্ক করেছেন, কিন্তু আদালত কোন কথা শোনেনি। যাক, আমি খুন করিনি, তবু ফাঁসি যাচ্ছি। কিন্তু আমার দুঃখ নেই। এ উচিত বিচার—আমি ত আর একটু হলেই খুন করেছিলেম—আর কোনদিনই আল্লার নাম কখনও মনে করিনি, আজ বলছি, তিনিই যথার্থই দয়াময়!

তিনি আমায় মাতৃহত্যার পাপ থেকে রাক্ষা করেছেন। যতক্ষণ সে বাড়ীতে ছিলেম, আমি মুখ ঢেকে রেখেছিলেম, পাছে সে নেমে এসে আমায় চিন্‌তে পারে! করিম, তোমার পুরানো বন্ধুর অনুরোধ রেখ—চুরি করো না—আমার সোরাবকে চুরি শিখিওনা—না খেতে পেয়ে মরে যায় যদি, সেও ভাল! আর মুন্না—আমার ঘরে এসে চিরকাল তার কষ্টেই কাটল! বেচারী, সে!”

চিঠিখানা পড়িয়া করালীকে ফেরত দিলাম। ভস্মাবশেষ চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করালী বলিল, “করিম যে তার বন্ধু, তারই কান-কাটা—আর বন্দুকটাও ওর বন্দুকের জোড়া, কিন্তু সে প্রমাণ ত আগে পাওয়া যায়নি। লোকটা সৎপথে থাকলে সুখে দিন কাটাত, কিন্তু মানুষ ভ্রমের দাস! যাই হোক্, ফুলটি এই সব নানা কারণেই আমি ফেলে দিইনি, যত্ন করে পিনে এঁটে রেখেছি।”

গল্প

দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রালোক-বিরল প্রশস্ত সজ্জিত মর্ম্মর-শীতল প্রকোষ্ঠে রাজোচিত আস্তরণে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে অবস্থান করিয়া স্বর্বর্ণের আল্‌বোলায় সুগন্ধি তাম্রকূটের ধূমপান করিতে করিতে মহারাজা সুজিৎসিংহ পারিষদবৃন্দ পরিশোভিত হইয়া সেনাপতি মাধোসিংহের গল্প শুনিতেছিলেন। গল্প ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। সপারিষদ মহারাজ উৎসাহিত নেত্রে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। আলবোলার কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তাহার ক্ষণস্থায়িত্ব সপ্রমাণ করিতেছিল। সেনাপতি বলিতেছিলেন—

"তারপর চিরন্তন নিয়মানুসারে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে যথেষ্ট ভালবাসিয়া ফেলিল। তথাপি তাহাদের সুখ ছিল না। যুবক অমরসিংহ যৌবনের অদম্য আবেগ-উদ্যমে সহস্র কণ্ঠে আপনার ভালবাসা ব্যক্ত করিতে গিয়া—বালিকা লক্ষ্মীর ঈষৎ রহস্যময় হাস্যে লজ্জিত স্তম্ভিত হইয়া পড়িত। কখনও-বা অমরসিংহের বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে শুনিতে লক্ষ্মীর উজ্জ্বল কালো চোখ্ অশ্রু-সজল হইয়া উঠিত। একটা ছোট চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে বলিত, "অমর, তুমি এত নিষ্ঠুর! আহা! মানুষ মানুষের বুকে কি করে ছুরি মারে?" তাহার মুখের ক্ষুদ্র দুইটি মাত্র অক্ষর, সেই 'আহা' কথাটিতে কত বেদনা, কত করুণা, আর্ত্তের প্রতি কি মধুর সমবেদনা ফুটিয়া উঠিত! আর সেই ক্ষুদ্র বালিকার

নিকট বীর যোদ্ধা আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিত। বালিকা লক্ষ্মী, সকলের প্রশংসা-পাত্র অসামান্য যোদ্ধা অমরসিংহকে আপনার নিকট অত্যন্ত বিনীত ভাবিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে যেন নত হইয়া পড়িত। দুইজনেই ভাবিত, তাহারা পরস্পরের কত অযোগ্য! তবু একদিনের অদর্শনে দুইজনের চোখেই সংসার শূন্য, জীবন বিড়ম্বনাময় মনে হইত। লক্ষ্মীর পিতা দেবকিষণ সিংহ অধিকাংশ সময় তীর্থ-পর্য্যটন এবং কাশীতে গুরুগৃহবাসে অতিবাহিত করিতেন। গৃহে কুমারী লক্ষ্মী ও পুত্র রাধাকিষণ, বৃদ্ধা ধাত্রী হীরাবাইয়ের তত্ত্বাবধানেই থাকিত। রাধাকিষণ সৌন্দর্য্যে ও স্বভাবে ভগ্নীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সে আপনাকে মহারাজ বলবন্ত সিংহেরই সমকক্ষ মনে করিত। প্রত্যেক কথায় ও ব্যবহারে তাহার অস্বাভাবিক দাম্ভিকতা অতি বিসদৃশভাবেই প্রকাশ পাইত। সে যে মহারাজ বলবন্ত সিংহ না হইয়া সামান্য পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে অপরিণামদর্শী বিধাতার পক্ষপাতিত্বই সে পদে পদে অনুভব করিত। সেই জন্যই বিধাতার সৃষ্ট জীব মাত্রেরই প্রতি তাহার অল্পাধিক পরিমাণে অসন্তোষ প্রকটিত হইয়া উঠিত। এমন কি, অনেক সময়, আপনার সরলা ভগ্নী লক্ষ্মীর প্রতিও অকারণ নির্য্যাতনে সে ক্ষান্ত হইত না। সেনাপতি অমরসিংহের প্রতি তাহার মনোভাব কিছুমাত্র অনুকূল না থাকিলেও বৃদ্ধ পিতার ভয়ে প্রকাশ্যে কোন রূঢ় কথা বলিতে সে সাহস করিত না।

একবার রাজা বলবন্ত সিংহের একটা প্রকাণ্ড হস্তী ক্ষেপিয়া সহরে বাহির হইয়া পড়ে। চারিদিকে ঠেলাঠেলি-হুড়াহুড়ি ক্রন্দন-কোলাহল পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ দেবীকিষণ কার্য্যান্তে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সহসা উন্মত্ত

রাজহস্তী চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য দলিত মথিত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। চারিদিকে 'হায়, হায়,' 'গেল, গেল' শব্দ উঠিল। বাক্ ও চলৎশক্তিহীন হইয়া বৃদ্ধ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র! এখনই বৃদ্ধের দেহ হস্তী-পদতলে চূর্ণ হইয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া যাইবে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই মত্ত হস্তী গভীর গর্জ্জনে পশ্চাতে হঠিল, পরক্ষণেই উপর্য্যুপরি বন্দুকের ভীষণ শব্দের সহিত দৃশ্যভূমি ধূমাচ্ছন্ন কুহেলিকা-বেষ্টিত হইয়া পড়িল। ধূম অপসারিত হইলে বিস্মিত জনসমূহের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় সেনাপতি অমরসিংহের জয়।" সেই দিন হইতে দেবীকিষণ জীবন-দাতা অমরসিংহের নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ। তার পর বৃদ্ধের নিরতিশয় যত্নে সেনাপতি যে দিন দেবীকিষণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া অসামান্য রূপরাশি-মণ্ডিতা তরুণী লক্ষ্মীকে প্রথম দেখিলেন, সেই দিন—সে শুভ, কি অশুভ মুহূর্ত্ত, তাহা সেনাপতির ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। সেইক্ষণে সেনাপতি আপনার বীর-হৃদয় হারাইয়া ঘরে ফিরিলেন। লক্ষ্মীর সরল স্নেহপূর্ণ সুমধুর ব্যবহারে সেনাপতি আপনার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার সাহস বা সুযোগ পান নাই।

লক্ষ্মীর পিতা দেবীকিষণ কন্যার সকল কার্য্য স্নেহপূর্ণ নেত্রে দেখিলেও ভ্রাতা রাধাকিষণ কঠিন বিচারক বা হৃদয়হীন সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তাহা দেখিয়া থাকেন। বয়স্কা অনূঢ়া ভগ্নী তরুণ যোদ্ধার সহিত কথাবার্ত্তা-মেলামেশা করে, ইহা তাঁহার নিকট একান্ত বিসদৃশ ও অপমানজনক মনে হইতেছিল। অমরসিংহ যে শুধু কুটিলতা করিয়াই সরলা সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে রাধা-কিষণের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভগ্নীকে ধমক দিয়া পিতার নিকট

প্রকারান্তরে তিনি অভিযোগ অনিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। অধিকন্তু দেবীকিষণ স্মিত হাস্যে জানাইলেন যে, শৈশবে মাতৃহীনা দুঃখিনী 'লছমিয়ার' বুঝি এতদিনে শিব-পূজার ফল সার্থক হইতে চলিয়াছে! তাঁহাকে চির-জীবনের জন্য গভীর ঋণজালে জড়িত করিয়া অচিরেই যে সেনাপতি তাঁহার দুঃখিনী কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবেন, এ ভরসাও তাঁহার আছে! শুধু সেই ভবিষ্যৎ সুখের মুহূর্ত্তটির আগমন-প্রত্যাশাই এবার তাঁহাকে এতদিন গৃহবাসে বদ্ধ রাখিয়াছে।

পিতার এই অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় পুত্রের মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। সে ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাবে জানাইল, তাহাদের মত উচ্চবংশীয়া কন্যা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইলেও দেবীকিষণ রাণা প্রতাপসিংহের বংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন—রাজার ঘরে পড়িবার কথা। লক্ষ্মীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও মৃদু প্রকৃতি দিলেও বিধাতা তাহাক অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির অধিকারিণী করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী অবশ্যই রাজরাণী হইবে। বৃদ্ধ পিতা হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, দুরাশার বশীভূতা হইয়ো না, আকাশ-কুসুমে মনের অশান্তি বাড়িয়াই চলে; আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।" রাধাকিষণ সে কথা কানেও তুলিল না! মাঝ হইতে নিষ্ফল ক্রোধের পুঞ্জীভূত অগ্নিরাশি বজ্রের মত সেনাপতির শিরে নিক্ষিপ্ত হইল।

সেদিন দোল-পূর্ণিমা! সমস্ত সহর হাস্য-কৌতুকে, উৎসবে-আবিরে রঞ্জিত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সারাদিনের প্রাণহীন আনন্দস্রোত হইতে মুক্তি পাইয়া সন্ধ্যার সময় সেনাপতি লক্ষ্মীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তখন পূর্ণিমার চাঁদ ষোলকলায় পূর্ণ উদ্ভাসিত; আর সেই

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকে উপহাস করিয়াই ষোড়শী লক্ষ্মী রাজ-রাজেন্দ্রাণী মূর্ত্তিতে তাঁহারই আশা-পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ণিমার চাঁদ তাহার অনিন্দ্য মুখে সহস্র ধারে কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। মুক্ত পবন তাহার বন্ধনহীন কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছিল। লক্ষ্মী সেদিন হোরি-উপলক্ষে রক্তবস্ত্রে আপনার গৌরদেহ আবরিত করিয়াছিল। সেনাপতির মুগ্ধ নেত্রে তরুণী লক্ষ্মী আজ বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল সুগন্ধ, সকল সঙ্গীত লইয়া অপরূপ মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। তাঁহার মনে হইতেছিল, জগতে তাঁহারা দুইটি প্রাণী ছাড়া বুঝি আর কেহ নাই। কিছু নাই!

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "অমর সিংহ, আজ তুমি অনেক দেরী করে এসেছ। আমি মনে করেছিলেম—" কথা শেষ না করিয়াই সে লজ্জিত-ভাবে মুখ নত করিল। সেনাপতির সহস্র সাগ্রহ প্রশ্নে আপনার অঞ্চল হইতে একগাছি সুন্দর শেফালি ফুলের মালা বাহির করিয়া সে বলিল, "এই মালা-গাছটি তোমার জন্যই গেঁথেছিলাম।" সেনাপতি হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি বিলম্বের জন্য আমি বঞ্চিত হলাম?"

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া কোমল হস্তে রচিত, তাহার নিশ্বাসেরই মত, সুরভি-স্নিগ্ধ, সেই পুষ্পমালা অমর সিংহের গলায় পরাইয়া দিল। লক্ষ্মীর সেই আয়ত কৃষ্ণ-তার উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি আত্মবিস্মৃত হইলেন। সহসা উচ্ছ্বসিত আবেগে লক্ষ্মীর পদতলে নতজানু হইয়া কম্পিত কণ্ঠে অমর বলিলেন, "সত্যই কি, লক্ষ্মী, তুমি আমায় আজ মালা দিলে? এক বৎসর ধরিয়া যে কথা বলিব-বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই, আজ তাহাই বলিব। বল, লক্ষ্মী, তুমি

কি আমার পত্নী হইয়া আমায় চিরসুখী করিবে?" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, রুদ্ধ কণ্ঠে অসমাপ্ত কথা শেষ করিলেন।

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। অমরসিংহের এই আকস্মিক ভাব-বিপর্য্যয়ে ও অতর্কিত প্রশ্নে সে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উত্তর দিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছিল। অসহায়ভাবে শুধু সে তাহার আয়ত বাষ্পসজল দৃষ্টি সেনাপতির মুখের উপর স্থাপিত করিল। সেনাপতি বালিকার মনোভাবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "বল, লক্ষ্মী, তুমি আমার,—আমার নিরাশ জীবনের—" আর বলা হইল না। সহসা ক্রুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেশ! সেনাপতির উপযুক্ত কার্য্য বটে! নিশীথ রাত্রে বিশ্বস্ত বন্ধুর গৃহে নির্জ্জনে বন্ধু-কন্যার নিকট প্রণয়-জ্ঞাপন, অতি উন্নত উদার চিত্তের পরিচায়ক!"

সহসা সম্মুখে বজ্রপতন হইলেও তাঁহারা অধিক বিচলিত হইতেন কি না, সন্দেহ! রাধাকিষণ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "সেনাপতিকে বীর বলিয়াই জানিতাম, তিনি রমণী-হৃদয় জয় করিতে এত ব্যস্ত, তাহা এতদিন জানিতাম না; জানিলে, বন্ধুভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতাম কি না! সন্দেহ।" পরক্ষণে ভগ্নীর প্রতি ফিরিয়া তীব্র ঘৃণার সহিত বলিল, "হতভাগিনি, প্রতারকের কুহকে ভুলিতে বসিয়াছ?" লক্ষ্মী করুণ কোমল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাদা, অমরসিংহ—"

"আবার ও নাম যদি মুখে আন লক্ষ্মী ত তোমার দেহ নর্ম্মদার জলে ভাসাইয়া দিব।" বলিতে বলিতে ক্রোধোন্মত্ত ভ্রাতা সবলে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা লক্ষ্মীকে একপ্রকার ভিতরে টানিয়াই লইয়া গেল।

লজ্জিত ক্ষুব্ধ সেনাপতি পদদলিত সর্পের মত আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইতেছিলেন। নিষ্ফল রোষে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; অজ্ঞাতসারে বারবার কোষস্থ শাণিত তরবারিতে হাত পড়িতেছিল। কিন্তু হায়! সেই উদ্ধত, গর্ব্বিত যুবক, সেই অপমানকারী মহাশত্রু, সে যে তাঁহারই প্রিয়তমার ভ্রাতা! ক্ষণপরেই রাধাকিষণ ফিরিয়া আসিল, অমরসিংহের প্রতি আপনার কুটিল চক্ষের তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সেনাপতি, জানিয়া রাখ, আজ হইতে তুমি আমার পরম শত্রু, আমার গৃহে চিরদিনের জন্য তোমার প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ জানিও।"

দারুণ অপমানে অমরসিংহের কর্ণমূল অবধি রক্তিম হইয়া উঠিল। তথাপি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "রাধাকিষণ সিংহ, তুমি ভুল বুঝিতেছ। লক্ষ্মীর প্রতি আমার কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই, আমি তাহাকে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীরূপেই পাইতে চাই, তাই—"

অমরসিংহের কথায় বাধা দিয়া স্পর্দ্ধিত যুবা হা-হা শব্দে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিল। সেই মহাশব্দে ভীত হইয়া দুই-একটা নিশাচর পক্ষী বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। হাসি থামিলে রাধাকিষণ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তাই—তাই সেনাপতি গভীর নিশীথে, নির্জ্জন বনপ্রদেশে, যুবতী লক্ষ্মীর কানে ভালবাসার কাহিনী রচনা করিয়া শুনাইতেছিলে, না? বীরপুরুষের উপযুক্ত ব্যবহার বটে! জানিতে পারি কি, বীর, এইরূপে কয়টি ধর্ম্মপত্নী সংগ্রহ করিয়াছেন! যাহা হউক, মহাশয়ের এই অসামান্য অনুগ্রহ-লাভে আমরা অক্ষম। এখন দয়া করিয়া এ অধীনকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। সাবধান, অমরসিংহ! কুলমহিলার প্রতি চাহিয়ো না।"

সেনাপতিকে উত্তরের অবসরমাত্র না দিয়া, গর্ব্বিত যুবা দৃঢ় পদক্ষে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইল। আর মর্ম্মপীড়িত অপমানিত সেনাপতি নিষ্ফল রোষে জ্বলিতে জ্বলিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। হায় লক্ষী!

আবার তাঁহাদের মিলন হইল। কিন্তু সে মিলন, কি নিষ্ঠুর! সারাদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তখনও আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘে সপ্তমীর চাঁদকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। আর্দ্র তৃণের উপর শাখাচ্যুত শেফালি পড়িয়া ফুল-শয্যার মত দেখাইতেছিল। অদূরে শিলাসনে অমরসিংহ। আর তাঁহার পদতলে, তাঁহারই চিরবাঞ্ছিতা, চিরসাধনার ধন লক্ষ্মী উর্দ্ধনেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়াছিল। অমরসিংহের মুখ গম্ভীর, অগ্ন্যুৎপাতের পর আগ্নেয়গিরি যেমন, ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বে পৃথিবী যেমন সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে, তেমনই উৎক্ষিপ্ত, অথবা বর্ষণমুখর বর্ষা-রজনীর মতই অজস্র রুদ্ধ অশ্রুজলে আত্মগোপন করিতে ব্যগ্র। ক্ষত্রিয় বীর প্রাণের অপেক্ষা মানকেই উচ্চ ভাবিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইলেও অবশেষে মানেরই জয় হইয়াছে! তাই আজ অমরসিংহ স্বহস্তে আপনার হৃৎপিণ্ড-উৎপাটনে বদ্ধপরিকর। তাই আজ চির-জীবনের জন্য লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন। কি তুচ্ছ রমণী-প্রেম—যাহার জন্য বীর হইয়া কাপুরুষের মত, যোদ্ধা হইয়া নারীর মত, নীরবে নত শিরে অপমানের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে!

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। লক্ষ্মীর আলুলায়িত নিবিড় কেশরাশি সন্ধ্যার অন্ধকারের মত দেখাইতেছিল। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেনাপতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "লক্ষ্মী, আজ হইতে

অমরসিংহের নাম ভুলিয়া যাও। আজ হইতে জগতের চক্ষে অমরসিংহ মৃত। আজ হইতে তোমায় আমায় সকল সম্বন্ধ ফুরাইল!"

সত্যই কি তাই? সত্যই লক্ষীর সহিত সকল সম্বন্ধ ফুরাইল? সেনাপতি নিজের কণ্ঠ-স্বরে নিজেই শিহরিয়া নীরব হইলেন। লক্ষী কোন উত্তর দিল না। অবারিত অশ্রুধারা তাহার সুন্দর মুখ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। অন্ধকারে অমরসিংহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি উঠিয়া স্থির স্বরে বলিলেন, "সেই ভাল, লক্ষী! আজ হতে অমরসিংহের নাম ভুলিয়া যাও,—তবু, তবু তোমার নিকট আজ চির-বিদায়ের দিনে এ ব্যবহার আশা করি নাই!" হায় হতভাগ্য অমর, তুমি আজ লক্ষীকে নূতন দেখিলে? তুমি কি জান না যে, লজ্জাবতী লতা আজ কি ভীষণ ঝটিকায় উন্মূলিতা!

এ অবস্থায় লজ্জা চলে না। দারুণ কষ্টে লজ্জাশীলা লক্ষী লজ্জা ত্যাগ করিল। কম্পিত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "অমরসিংহ! নিষ্ঠুর! কি অপরাধে আমায় ত্যাগ করিলে?" আর বলা হইল না, অশ্রুজলে তরুণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতির হৃদয়ে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র! পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া শান্তভাবে অমরসিংহ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "লক্ষী, ত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? জান কি লক্ষী, মানুষ আপনার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে, কেমন করিয়া? ভুলিয়া যাও, লক্ষী, আমরা স্বপ্ন দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে সে কথা ভুলিয়া যাও! আশীর্ব্বাদ করি, চিরসুখিনী হও, রাজরাণী হও।"

আর বলা হইল না, অবাধ্য চিত্ত বুঝি আর বশ মানে না! তাঁহার

আরাধ্যা লক্ষ্মী! ইহজীবনের না হইলেও, পরজীবনে একমাত্র তাঁহারই লক্ষ্মী অজ্ঞাতসারে যে বাক্য উচ্চারণ করিল, তাহা যেন তাঁহার হৃদয়ের সহিত বিদ্রোহ করিয়া হৃদয়ের ক্ষতস্থলে বিদ্ধ হইয়া প্রত্যেক শিলাখণ্ডে, প্রত্যেক শাখায় আহত হইয়া বায়ুস্তরে ভাসিতে ভাসিতে দূর শূন্যে ধ্বনিত হইল। অমরসিংহ বুঝিলেন, প্রতিজ্ঞা বুঝি যায়, রমণীর প্রেমে তাঁহার চির-গৌরবান্বিত সম্মান বুঝি স্রোতের মুখে তৃণ-খণ্ডের মতই ভাসিয়া যায়! দুই হস্তে উদ্বেলিত বক্ষ চাপিয়া কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "বিদায় দাও, লক্ষ্মী! সত্যই অমর-সিংহ নিষ্ঠুর, সে আজ স্বর্গ ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় নরকে চলিয়াছে। অভাগিনী, অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে,—হতভাগ্য অমরসিংহ প্রাণ অপেক্ষা মানকেই উচ্চ ভাবিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী, যদি কখনও মনে পড়ে, তখন ভাবিও, অমর নিষ্ঠুর, অমর হৃদয়হীন পাষাণ মাত্র, কিন্তু সে অবিশ্বাসী নয়। মনে করিও, সে তাহার প্রাণাধিকার অসুখের কারণ হইলেও নিজে কখনও সুখী হয় নাই। তখন লক্ষ্মী, তখন—" আর বলা হইল না। ছিন্নমূল লতিকার মত হতচেতনা লক্ষ্মী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। হায় বীর! কোথায় তোমার সে আত্মাভিমান, কোথায় সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় সে ত্যাগ-স্বীকার! সেনাপতি সযত্নে লক্ষ্মীকে তুলিতে গিয়া দেখিলেন, সে মূর্চ্ছিতা। ধীরে ধীরে সেই চেতন-হীনা রমণীর দেহ আর্দ্র ঘাসের উপর ভূশয্যায় শায়িত করিয়া অমরসিংহ নতজানু হইয়া আর একবার সে মুখ দেখিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "অভাগিনী, ইহাই তোমার চিরনিদ্রা হউক।" তারপর দৃঢ় পাদক্ষেপে আপনার গন্তব্য-পথে তিনি চলিয়া গেলেন, একবারও পশ্চাতে ফিরিলেন না!

প্রলোভন—! হাঁ, প্রলোভন বই কি! অমরসিংহ তাহা সম্বরণ করিলেন।

২

গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সেনাপতি মাধোসিংহ বিশ্রামের জন্য নীরব হইলে, বৃদ্ধ মন্ত্রী অনন্তমল্ল ও পারিষদবৃন্দ সকলেই অশ্রুসজল উৎসুক নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিলেন, যেন আরও কিছু শুনিবার ইচ্ছা! এটা যে গল্প, শুধু গল্পমাত্র, তাহা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন! সকলের মনে শুধু জাগিতেছিল, সেই করুণ বিদায়-দৃশ্য! তাহা যেন অতীতের কোন্ মায়াজাল অপসারিত করিয়া সত্যের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আরাম-গৃহ গভীর নিস্তব্ধ, শুধু গৃহ-তলবাহী নর্ম্মদার উচ্ছ্বসিত জলরাশি রাজ-প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তিমূলে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল! তাহারই মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছিল। কচিৎ দুই-একখানা বোঝাই নৌকা হইতে দাঁড়ি-মাঝিদের অসংলগ্ন তানলয়হীন গীতধ্বনি জলের শব্দের সহিত মিলিয়া বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছিল।

মহারাজ সুজিৎসিংহ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "মাধোসিং!" সেনাপতি অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, "মহারাজ!"

রাজার ক্রুদ্ধ মুখ আসন্নবর্ষণ মুখর শ্রাবণের মেঘোদয়ের মত দেখাইতেছিল। গম্ভীর স্বরে রাজা বলিলেন, "মাধো সিং! তোমার আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য কিছু বলিবার আছে?"

"কিছু না, মহারাজ!"

রাজা ডাকিলেন, "প্রহরী!"

অচিরে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী অভিবাদন করিয়া আজ্ঞা-পালনের

প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলে, রাজা বলিলেন, "সেনাপতি তোমাদের বন্দী। লইয়া যাও, ইহাকে।"

প্রহরীদ্বয় কিছু বুঝিতে পারিল না, তাই বুঝিবার নিষ্ফল চেষ্টায় একবার সকলের মুখের প্রতি চাহিয়া মাথা চুলকাইয়া মূঢ়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীরব পারিষদবৃন্দ অর্থহীন দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি চাহিল।

বৃদ্ধ মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এ কাজটা—"

রাজা ধমক দিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, ইচ্ছা থাকে, অবসর লইতে পার! সুজিৎসিংহ কাহারও নিকট অযাচিত উপদেশ গ্রহণ করে না।"

মন্ত্রী শুভ্র শ্মশ্রু কণ্ডুয়ণ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। গতিক দেখিয়া কেহই কোন কথা কহিল না। রাজা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "নিমকহারাম, ডাল-রুটীর শ্রাদ্ধ করিতে পার, হুকুম তামিল করিতে পার না?" ধমক খাইয়া প্রহরীদ্বয় সেনাপতির দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, গায় হাত দিতে তাহাদিগের সাহস হইল না। সেনাপতির বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখের প্রতি চাহিয়া অন্তরের অন্তরে তাহারা একটা ভীতি-কম্পন অনুভব করিতেছিল।

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভুল করিতেছেন, সেনাপতি মাধোসিংকে বন্দী করিবার ক্ষমতা সামান্য প্রহরীর নাই।" পরক্ষণে প্রহরীদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "নেহাল সিং, আমি তোমাদের বন্দী। চল, কোথায় লইয়া যাইবে। আমি প্রস্তুত। সেনাপতি বিদ্রোহী নয়, রাজ-আদেশ শিরোধার্য্য।"

অগ্রে সেনাপতি, পশ্চাতে ভীত সশস্ত্র প্রহরীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত হইলে রাজা মনে মনে অশান্তি অনুভব করিলেন। বন্দীকে বন্দীর মত লইয়া যাওয়াই চিরন্তন পদ্ধতি। বন্দীকে নিমন্ত্রিতের মত পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া কোন রাজনীতি-শাস্ত্রে লেখে না। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার নহে বলিয়াই মহারাজ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন।

সেনাপতি কি তাঁহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ঠিক বালকের আবদার-রক্ষার মত সকরুণ কৃপা প্রদর্শন করিল না? সেনাপতি কি রাজাকে সিংহাসনোপবিষ্ট মৃণ্ময় পুত্তলির মতই চেতনা-হীন জড়পদার্থ মনে ভাবিল না? কিন্তু কেমন করিয়া তিনি বুঝাইবেন যে, তিনি বাস্তবিক তাহা নহেন! তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সের মধ্যে এমন বিভ্রাট আর কখনও ঘটে নাই! তাই তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! তথাপি তিনি নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, সেনাপতির অপরাধটা কি!

৩

দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্র খোলা জানালার মধ্য দিয়া সেনাপতির অপ্রশস্ত কারাগৃহের ভিতর উঁকি দিয়া চাহিতেছিল। রাজা সেনাপতিকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন আদেশ দেন নাই। তাই প্রহরীরা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অন্তঃপুর ও বহির্বাটী-সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহাকে আনিয়া রাখিল! ঘরখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুপরিষ্কৃত ও যৎসামান্য সজ্জিত। গৃহের নীচে নর্মদা আপনার পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলে কূলে

ভরিয়া উঠিতেছিল। মধ্যাহ্নের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দুই একটি কৃষক-কন্যা ও কৃষক-বধূ জনবিরল ঘাট হইতে মৃণ্ময় কলসীতে জল ভরিয়া সিক্ত বস্ত্রে ঘরে ফিরিতেছিল। পাষাণ সোপানের উপর তাহাদের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে না হইতেই রৌদ্রতাপে তাহা শুখাইয়া উঠিতেছিল। কোন প্রতিবাসিনী সুন্দরী মধ্যাহ্ন-ভোজনের উচ্ছিষ্ট ভোজন পাত্র পরিষ্কৃত করিতে করিতে রাজবাটীর কোন মুক্তদ্বার গবাক্ষ-পথে উৎসুক কৌতূহল দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। দুই একটা বক মৎস্যের চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া গম্ভীর মৌনভাবে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত চুপ্-চাপ বসিয়া আছে।

সেনাপতি জানালার নিকট বসিয়া জলের দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু তখন নর্ম্মদার স্থির জলের সৌন্দর্য্য দর্শনে নিযুক্ত ছিল না। তাঁহার অর্থশূন্য উদাস দৃষ্টি তখন বহু দূরে অতীতের কোন্ মোহময় স্বপ্নরাজ্যে কি বিচিত্র ছবি দেখিতেছিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। সহসা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। ধীরে ধীরে কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিল, "সেনাপতি!" স্বপ্ন হইতে সহসা জাগরিত হইয়া সেনাপতি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে স্বয়ং মহারাজ সুজিৎসিংহ। সেনাপতি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন, "মহারাজ, আপনি?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি। মাধোসিং, তোমার গল্পের শেষ শুনিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি।" রাজার চক্ষু উজ্জ্বল, কৌতুকপূর্ণ।

সেনাপতি নতশিরে মৃদুভাবে বলিলেন, "মহারাজ! ভৃত্যের সহিত

পরিহাস রাজোচিত নয়।" রাজা একবার উদাস দৃষ্টিতে নর্ম্মদার গভীর জলরাশির প্রতি চাহিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন, "ঠিক, রাজা শুধু রাজকার্য্যপালনের যন্ত্র মাত্র—সিংহাসনের শোভা, পাষাণ পুত্তলি! পরিহাসও রাজাকে ওজন বুঝিয়া করিতে হয়।"

রাজা সুজিৎসিংহ পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবক মাত্র। যৌবন-সুলভ আশা ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু হাস্য-পরিহাস করিতে হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অংশ লইতে তাঁহার কোন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু নাই! রাজার চাটুকার-মোসাহেব দলের অভাব ছিল না। কিন্তু খাঁটি বন্ধুর অভাব, তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। তাই এই অল্পভাষী, রণকুশলী, বিনীত, প্রভুভক্ত, সুশিক্ষিত, কন্দর্পের মত রূপবান্, নবীন সেনাপতিকে পাইয়া রাজা বড় সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেরই মধ্যেই তিনি নিজের ভুল বুঝিলেন। রাজা দেখিলেন, সেনাপতি রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, রাজার সুপরামর্শদাতা প্রভুভক্ত ভৃত্য, উদার-হৃদয় বন্ধু, কিন্তু হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অংশভাগী, হাস্যপরিহাস-নিপুণ বয়স্য নয়। সেনাপতির এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সমাদরে রাজ্যের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারীই রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যাহার সৌভাগ্যে সমস্ত দেশবাসী ঈর্ষাকূল—তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। রাজকার্য্যের অবসানে অধিকাংশ কাল তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। লোকে ভাবিত, অহঙ্কার! রাজার সুনজরে পড়ায় সেনাপতির নির্জ্জনবাস-সুখও ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছিল। সেনাপতি তাহাতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে না করিয়া বিপন্নই ভাবিতেছিলেন। সংবাদ লইয়া রাজা জানিলেন, সেনাপতির গৃহে আত্মীয়

কেহ নাই। উপার্জ্জনের অর্থ অধিকাংশই দান-ধ্যানে ব্যয়িত হয়। সাধু-চরিত্র যুবক সর্ব্বদা পরোপকার-পরায়ণ। সেনাপতির সম্বন্ধে রাজা যতই সংবাদ লইতেছিলেন, ততই তাঁহার প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিলেন। স্বল্পভাষী অজ্ঞাত-চরিত্র যুবকের হৃদয়ে যে কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই লোক-চরিত্র-অভিজ্ঞ রাজা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী-লোকের ভালবাসা লইয়া নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সেনাপতির সহিত তর্ক করিতে চাহিতেন। সেনাপতি সহজেই হার মানিয়া রাজার মতে সায় দিতেন। একদিন রাজার একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি গল্প বলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে, যখন নিতান্ত নীরস প্রকৃতিও উচ্ছ্বসিত, রুদ্ধ প্রকৃতিও মুক্ত হইয়া উঠে!

গল্প বলিতে বসিয়া সেনাপতি সহজেই আপনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। অগত্যা বাধ্য হইয়াই কলের পুতুলের মত তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন। সহসা মধুর রস রুদ্রে পরিণত হইল। গল্পের নায়িকা লক্ষ্মীর মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত-চিত্ত নবীন রাজা সেনাপতিকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। অথচ স্বয়ং বিচারকই তখন জিজ্ঞাসিত হইলে সেনাপতির অপরাধের প্রমাণ দিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ!

সহসা বস্তিতে অগ্নি লাগিলে দমকা বাতাসের জোরে যেমন অগ্নি-শিখা সমস্ত সহরময় ছড়াইয়া পড়ে, সেনাপতির বন্দী হওয়ার সংবাদ চারিদিকে তেমনই সবেগে ছড়াইয়া পড়িল। বন্দী হইবার কারণ-

প্রকাশেও বিলম্ব ঘটিল না। কারণটা মুখে-মুখে নানারূপ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীনেরা মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এ ঘটনা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আশা করিয়াছিলেন। অজানা অচেনা বিদেশী ছোঁড়াকে এতদূর আধিপত্য দেবার এই ফল! আজও যখন চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত যথা-নিয়মে চলিতেছে, তখন ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় ঘটিবেই! তাঁহারা নাকি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছেন, সেনাপতি মোগলের সহিত যোগ দিয়া রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হইবার মতলব করিতেছিলেন। এখন, উর্ণনাভ যেমন নিজের জালে নিজেই জড়িত হয়, বাছাধনেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে!

নবীনেরা আপত্তি করিয়া বলিলেন, ঠিক তাহা নহে! সেনাপতি মৃগয়ায় গিয়া হরিণ মারিবার ছলে রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িয়াছিলেন। পিতৃপুণ্যে ঠিক সেই সময় ঘোড়াটা কি দেখিয়া ভয় পাইয়া, পার্শ্বে হঠিয়া যায়, তাই তীরটা কপালে না লাগিয়া মুকুট উড়াইয়াই ক্ষান্ত হয়। পরীক্ষায় নাকি জানা গিয়াছে, তীরটা ভয়ানক বিষাক্ত!

স্ত্রীলোকেরা স্নানের ঘাটে জলে আগ্রীব দেহ ডুবাইয়া পরস্পরের সহিত অর্থপূর্ণ কটাক্ষ-বিনিময় করিয়া জানাইলেন, "সেনাপতি বীর, সুপুরুষ, পরোপকারী, তবু রাজভগ্নীকে বিবাহ করিবার স্পর্দ্ধা করা বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার মতই বাতুলতা-প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

ফল কথা, সেনাপতির প্রতি রাজার অতিরিক্ত সমাদরে তাঁহার

শত্রুর অভাব ছিল না, তাই তাঁহার আকস্মিক বিপদে কেহই আন্তরিক দুঃখিত হইল না। কেবল বালকের দল তাহাদের খেলিবার সঙ্গী, শস্ত্রশিক্ষার গুরু, গল্প বলিবার, আদর করিবার, বায়না শুনিবার প্রিয়জনকে হারাইয়া নীরবে অশ্রু মুছিল। আর ব্যথিত হইল, নিরাশ্রয়, ক্ষুধাতুর, দীন দুঃখীরা।

কথাটা যখন সকলেই শুনিল, তখন অন্তঃপুরে মহারাণী কমলকুমারীও সখীমুখে তাহার সালঙ্কার বর্ণনা-লাভে বঞ্চিতা হইলেন না। তাহার ফলে অসময়ে অন্তঃপুরে মহারাজের তলব পড়িল। রাজা দেখিলেন, বৈদ্য, হাকিম ও নানাবিধ ঔষধে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসায় ভিষকের দল সসম্ভ্রমে জানাইল, মহারাণী-মাতার আদেশে, তাঁহারা মহারাজের চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়াছেন। মহারাজের পীড়ায় যে ভয়ের কারণ বর্ত্তমান নাই, তাহা যে সামান্য মধ্যমনারায়ণ তৈল এবং দুই-একটা ঔষধেই সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইবে, সে কথা তাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারেন।

রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার দারুণ বিরক্তিপূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া ভিষক্‌বৃন্দ আপনাদের অভিজ্ঞতা ভুলিয়া যে যাহার পথ দেখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাজা বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সকলকার মতই প্রকৃতিস্থ। রাণী সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কারণ স্বয়ং মহারাজই বলিতেছেন, সেনাপতির কারারোধ-সংবাদ সত্য! আর তিনি রাজার কোন অনিষ্টচেষ্টাও করেন নাই! ঘটনাটা শুধু পরিহাসমাত্র!

রাণী তাঁহার কুসুমগন্ধি অলকগুচ্ছ দুলাইয়া, ক্ষুদ্র মস্তক হেলাইয়া

অবজ্ঞার সহিত সে কথা অস্বীকার করিলেন। অগত্যা রাজাকে তাঁহার প্রকৃতিস্থতার প্রমাণ-স্বরূপ স্বীকার করিতে হইল যে, তিনি স্বহস্তে বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিয়া জানাইবেন, এটা শুধু রহস্যমাত্র। তাই সঙ্গীমাত্র না লইয়াই রাজা কারাগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে চলিতে চলিতে আপনার ব্যবহারের কথা মনে করিয়া রাজা মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলেন।

রাজা যখন বলিলেন, বিষয়টা শুধু পরিহাসমাত্র, তখন সে কথায় কেহই বিস্ময় প্রকাশ করিল না। সেনাপতির আকস্মিক সৌভাগ্যোদয়ে যাঁহারা ঈর্ষাকুল ছিলেন, তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, রাজাদের পরিহাসও রাজকীয়! ভাগ্যে তাহারা রাজার প্রিয়পাত্র হয় নাই।

রাজা বলিলেন, "সেনাপতি, তোমার গল্প সত্যের চেয়েও সজীব। গল্পের শেষ চাই।" সেনাপতি সে কথা শুনিতে পাইলেন না, তিনি তখন নর্ম্মদার গভীর জলরাশির প্রতি চাহিয়াছিলেন। রাজা বুঝিলেন, সেনাপতি অন্যমনস্ক, চিন্তিত! তাই তিনি পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, গল্পের শেষ এ অধীনের জানা নাই। যতটুকু জানিতাম, বলিয়াছি।"

রাজা ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, কহিলেন, "মাধোসিং!"

"মহারাজ!"

"গল্পের শেষ চাই!"

সেনাপতি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, যদি নিতান্তই শুনিতে চান, তবে বলি। সেনাপতি অমরসিংহ সন্ন্যাসী হইয়া জীবনের

অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিলেন, আর—আর লক্ষ্মী? লক্ষ্মীর সেই মূর্চ্ছাই শেষ নিদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। এ একখানা বিয়োগান্ত নাটকের উপসংহারমাত্র।"

রাজা হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, "মিথ্যা কথা! অমরসিংহের সন্ন্যাসী হইবার মত দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন ও সুখে বিগতস্পৃহ হইবার মত জ্ঞান নাই। আর লক্ষ্মী—সেই অলোক-সামান্যা সুন্দরী, তাহার পরিণাম বিয়োগান্ত নাটিকায় সমাপ্ত করা অত্যন্ত হৃদয়হীন গ্রন্থকারের কার্য্য! লক্ষ্মী মরে নাই! তারপর?"

সেনাপতি হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ যে গল্প শুনিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন!"

রাজা উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিলেন, "ঠিক! আমি সে হতভাগিনীর জন্য যথার্থ ই অনুতপ্ত। সেনাপতি, তোমার গল্প শেষ কর। তুমি, বোধ হয়, শ্রান্ত আছ, তবে আজ থাক্! কিন্তু গল্পের শেষ আমি চাই!"

৪

আবার সেই বিশ্রাম-কক্ষ। সুবিস্তৃত উচ্চ গালিচার উপর সুবর্ণের কারুকার্য্যখচিত মখ্‌মলের আস্তরণের উপর মহারাজ সুজিৎসিংহ উপবিষ্ট। সম্মুখে নবীন সেনাপতি মাধোসিং, আশে-পাশে দুই-চারিজন সভাসদ্। আজ আর গৃহে অধিক লোক ছিল না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মুখে কোন আগ্রহ বা চাঞ্চল্যের ভাব ছিল না। নিস্তব্ধ গৃহে মধ্যে মধ্যে কক্ষগাত্রস্থিত ঘটিকা-যন্ত্রের শব্দের সহিত নর্ম্মদার কল-হাস্য মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছিল।

রাজা বলিলেন, "সেনাপতি, সেই নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন—অভিধানে যাহার উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই অপ্রেমিক অমরসিংহের জীবন-কাহিনী সমাপ্ত কর।"

সেনাপতির শান্ত চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল, বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সুন্দর মুখ আরক্ত হইল। মুহূর্ত্তে হৃদয়ভাব সংযত করিয়া শান্ত স্বরে সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ দূরদর্শী, আপনিই অনুমান করুন!"

রাজা বলিলেন, "উত্তম! আমার বোধ হয়, সরলা লক্ষ্মী চির-সন্ন্যাসিনী, অথবা তোমার কথানুসারে সমাধির শীতল শয্যায় নিরাশ প্রণয়ের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুখসুপ্ত! আর অমরসিংহ বিবাহিত, সংসারসুখে আত্মহারা, সম্ভবত নবোঢ়া পত্নীর শ্রবণে প্রণয়ের বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিতেছে!"

সেনাপতির নত মুখে বিষাদের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আপনি রাজকার্য্যে সূক্ষ্মদর্শী, কিন্তু প্রণয়-রহস্যে অনভিজ্ঞ।"

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। সভাসদেরা সেনাপতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। রাজা বলিলেন, "সেনাপতি, তোমার গল্প শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে চাই!"

সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, ললাটে স্বেদরাশি সঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, "ক্ষমা করুন, মহারাজ। গল্প শুনিয়া আপনার এ ভাব জন্মিবে জানিলে ভৃত্য কখনও ধৃষ্টতা-প্রকাশে সাহস করিত না। গল্প শুধু গল্পমাত্র।"

রাজার গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। স্থির স্বরে তিনি

বলিলেন, "সেনাপতি, তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, রাজা সুজিৎসিংহ প্রণয়-রহস্যে অনভিজ্ঞ হইলেও রাজকার্য্যে সূক্ষ্মদর্শী, মানব-হৃদয়-অভিজ্ঞতায় এতটুকু অভিজ্ঞ না হইলে রাজ্য এতদিন রসাতলে যাইত।"

"কি শুনিবেন, মহারাজ?" সেনাপতির মুখে নিরুপায়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"সত্য, শুধু অবিমিশ্র সত্য কথা। মহাবীর মাধোসিংহের পক্ষে সত্য কথা, বোধ হয়, এত দূর দুষ্প্রাপ্য নয়?"

সেনাপতি উত্তর দিলেন, "না।" কিন্তু তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সভাসদেরা বিস্ময় অনুভব করিতেছিলেন। গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ মূর্ত্তি, অসীম-সাহসিক যোদ্ধা আজ একান্ত অভিভূত, বিচলিত ভাবে নত নেত্রে মৃত্তিকার তলদেশে আপনার উদ্ধারের উপায়-অন্বেষণে ব্যগ্র! রাজা বলিলেন, "তার পর? লক্ষ্মীরও মৃত্যু হয় নাই। সেনাপতিরও সন্ন্যাসী হওয়া ঘটে নাই! তার পর?"

বিষাদের ক্ষীণ হাসি সেনাপতির ওষ্ঠপুটে আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মতই মিলাইয়া গেল। "না, মহারাজ, ঠিক্ ঐরূপ ঘটিলেই সৃষ্টি-রহস্য বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্য-জগতে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু সকল সময় মানবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া সংসার চলে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আপনার হৃদয়ের উপর অগাধ বিশ্বাস লইয়া অমরসিংহ যখন নিতান্ত কাপুরুষের মত চেতনহীনা প্রিয়তমার প্রতি কঠোর কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন, তখন মনে মনে যতটা আত্মপ্রসাদ-লাভের আশা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল না। পথে চলিবার সময় আপনার উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিতেছিল, শতবার ইচ্ছা হইতেছিল, ফিরিয়া গিয়া মর্ম্মপীড়িত

অভাগিনীর চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তথাপি তাহা ঘটিল না। পুরুষের আত্মাভিমান, রাধাকিষণের ঘৃণা-বাক্য সে সংকল্পের পথে বাধা দান করিতেছিল। হৃদয়ের দারুণ ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত, হতভাগ্য আকস্মিক হৃদয়বেদনায় উন্মত্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট কেন্দ্রচ্যুত উল্কা-পিণ্ডের মত ছুটিয়া চলিলেন। তিনি তখন কি করিতেছেন, কি করিবেন, কিছুই তাঁহার মনে ছিল না। মনে ছিল, শুধু লক্ষীর কথা, আর তাহার নিকট হইতে দূরে যাইবার কথা! গৃহ ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, দূর হইতে দূরান্তরে যাইবার কথা!

তারপর কত মাস, কত বর্ষ, কত শীত, কত বসন্ত আসিল গেল, সেনাপতি তাহা অনুভবও করিতে পারিলেন না। একদিন নব বসন্তের অভ্যুদয়ে বনস্থলী যখন ফলে-ফুলে সৌন্দর্য্যে-গন্ধে ভরিয়া উঠিতেছিল, সহসা তখন নিদ্রা হইতে জাগিয়া সেনাপতি প্রথম বুঝিলেন যে, জগৎ মরুভূমি, এবং জীবন প্রহেলিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে!

সেদিন রাজ্য জুড়িয়া এক অখণ্ড আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। সুসজ্জিত প্রজাবৃন্দ, নববিবাহিত রাজা হিরণ্যদেব ও মহারাণী কল্যাণময়ীকে দেখিবার জন্য পথে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সশস্ত্র প্রহরীর দল শান্তিরক্ষা করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় আরও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। সহস্র কণ্ঠে মুহুর্মুহু রাজা-রাণীর জয়-ঘোষণা হইতেছিল। প্রজা-বৃন্দের সানুনয় অনুরোধে প্রজাবৃন্দের মাতৃস্বরূপিনী মহারাণীর মুখাবরণ উন্মুক্ত করা হইলে, ক্ষণেকের জন্য উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবৎ জন-কোলাহল গভীর স্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। পরক্ষণেই গগনপথ বিদীর্ণ করিয়া নতশিরে প্রজাবৃন্দ মহারাজ ও মহারাণীকে

অভিবাদন করিয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিল। বহুমূল্য হীরকালঙ্কার-বিভূষিতা মণিরত্ন-মণ্ডিতা বহুমূল্য রেসমী বস্ত্রাবৃতা মহামহিমময়ী রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ে প্রণত হইল। নারীমূর্ত্তি সজীব দেবী-প্রতিমার মতই পবিত্র সুন্দর দেখাইতেছিল।

অগ্রগামী সেনাপতি অমরসিংহ দুই হস্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া পুনঃ পুনঃ সেইদিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বিশাল জনসঙ্ঘ, মহারাজ, মহারাণী, উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, সকলই ধূমময় ঘন কুহেলিকাচ্ছন্নবৎ অনুভূত হইতেছিল। পদতলে অশ্ব-সমেত স্বয়ং বসুন্ধরা সরিয়া যাইতেছিল! সেনাপতি কি জাগ্রত! ঘটনা কি সত্য।"

গল্প শেষ হইয়া গেল। সমস্ত বিষয়টা পরিস্ফুট না হইলেও বক্তার ভাবে, গল্প বলিবার অসাধারণ ভঙ্গীতে বিপুল আত্মবিস্মৃতিতে শ্রোতৃবর্গের চক্ষু আপনা হইতেই অশ্রুময় হইয়া আসিয়াছিল। রাজা শয্যা ছাড়িয়া সস্নেহে সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন, "অমরসিংহ, যথার্থই তুমি প্রণয়ী!" সভাসদেরা বিস্মিত চকিত নেত্রে যুগপৎ রাজা ও সেনাপতির প্রতি চাহিলেন। সেনাপতিকে নিরুত্তর দেখিয়া রাজা বলিলেন, "অমর সিংহ, আজ হইতে শুধু তুমি সেনাপতি নও, আমার প্রিয়তম বন্ধু। তোমায় বন্ধু-সম্ভাষণ করিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "মহারাজ, অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। দাস এ সম্মানের অনুপযুক্ত।"

রাজা মৃদু হাসিলেন, "না, বন্ধু! জহুরী বলিয়া সুজিৎ সিংহের নাম আছে।"

"আপনি ভুল করিতেছেন, অমরসিংহের নামটা শ্রুতিমধুর হইলেও তাঁহার অতীত জীবন, বোধ হয়, কোন বুদ্ধিমানেরই প্রার্থনীয় নয়।"

রাজার উজ্জ্বল চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। উন্নত মধুর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি বলিলেন, "তথাপি সত্য চিরদিনই অত্যজ্য। অমরসিংহ নাম গ্রহণে সেনাপতি অনধিকারী।"

সেনাপতির বিবর্ণ মুখ বিবর্ণতর হইয়া উঠিল। ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ক্ষীণ স্বরে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, গল্প শুনিয়া কি বুঝিয়াছেন, জানি না! তবে সেনাপতি, অমরসিংহ যদি মাধোসিংহ হয়, গল্পের নায়িকা, লক্ষ্মী—?"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই সেনাপতি নীরব হইলেন। উৎসুক সভাসদেরা ব্যগ্র দৃষ্টিতে রাজার মুখের প্রতি চাহিলেন।

স্তব্ধ গৃহ,—সূচীপতন শব্দটিও সুস্পষ্ট শুনা যায়! ধূসর সন্ধ্যা তখন চারিদিকের দৃশ্যাবলী অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। রাজার গম্ভীর মুখে যে ম্লানিমার ছায়া পড়িল, তাহা সন্ধ্যার মতই কুয়াশাচ্ছন্ন। সেনাপতির অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তরে দ্রুত কম্পিত কণ্ঠে রাজা উত্তর দিলেন, "আর লক্ষ্মী, স্বয়ং মহারাণী কমলকুমারী।"

ভুল

জীবনে অনেকেই হয়ত এমন অনেক ভুল করিয়াছেন, যাহা চিরদিনের জন্য অনুতাপের কারণ হইয়া আছে ; কিন্তু তুচ্ছ আমোদ করিতে গিয়া আমার মত এমন প্রবল ভুল কেহ কখনও করিয়াছেন কি না, জানি না।

সে আজ সাত বৎসরের কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সিতে বি, এ, পড়ি। উইলিয়ম্‌স্ লেনের একটি ছোট মেসের দ্বিতলে কাঠের পর্দ্দাযুক্ত এক কক্ষে আমার বাস। মেসে আরও অনেকগুলি ভদ্রলোক থাকেন। সকলেই অফিসে কর্ম্ম করেন। বিদ্যার্থীর মধ্যে কেবল প্রকাশ দা, আর আমি।

প্রকাশ দা আমার সহোদর নহেন। 'গ্রাম-সুবাদে' ও বহুদিনের বন্ধুতায় আমি তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া ডাকি, তিনিও আমায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহ-যত্ন করেন। আমার ঘরখানিতে আমি একাই অধিকার স্থাপন করিয়াছিলাম। প্রকাশ দা ও এক মার্চেণ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক অপর এক ঘরে থাকিতেন। আমাদের মেসের ঠিক সম্মুখে, প্রায় চারি হস্ত দূরে, গুপ্তসাহেবের প্রকাণ্ড শ্বেত অট্টালিকা আপনার ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের সাক্ষ্য-স্বরূপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ীটি আমাদের মেসের এত কাছে যে, অনায়াসে একখানা ছোট তক্তার সাহায্যে এ ছাদ ও ছাদ যাতায়াত করা চলে। বাড়ীর—আমাদের দিকের অংশটা, বোধ হয় কোন ব্যবহারে আসিত না। কারণ, এদিকের

জানালা-দরজা আমরা কখনও খুলিতে দেখি নাই। মনুষ্য-বাসের কোন চিহ্নও সেদিকে কিছু দেখা যাইত না।

সন্ধ্যার সময় কোনদিন আমার ঘরে, কোনদিন বা প্রকাশদা'র ঘরে একটি ছোট-খাট মজলিস বসিত। অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিতেন এবং তাঁহাদের সারাদিনের সঞ্চিত গল্পের বোঝা নামাইয়া যথাসাধ্য আমাদের সান্ধ্য পাঠের ও সময়ের অযথা ক্ষতি করিয়া দিতেন। তাঁহাদের সে ক্ষুদ্র সভায় চুরুটের ধোঁয়ার সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি হইতে ছোট-বড় কোন আলোচনাই বাদ পড়িত না।

একদিন বিকালে কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি, গুপ্তসাহেবের বাড়ীর আমাদের দিকের রুদ্ধ গবাক্ষ সহসা মুক্ত হইয়াছে! প্রায় তিন বৎসর এই মেসে আসিয়াছি, কখনও এদিককার জানালা খোলা দেখি নাই, তাই একটু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিলাম। মুক্ত গবাক্ষ-পথে গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যই বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ঘরখানি প্রশস্ত—কক্ষ-গাত্র পত্রপুষ্পে চিত্রিত করা, অনেকটা ইংরাজী ফ্যাশনে সজ্জিত। কৌচ, কেদারা, টেবিল, হোয়াট-নট্, পিয়ানো প্রভৃতি সুদৃশ্য সৌখীন বহুমূল্য আসবাবে ঘরখানি পরিপূর্ণ। দেওয়ালে খানকতক 'ফটো' ও কয়েকখানি অয়েল-পেণ্টিং। টেবিলের উপর জাপানী ফুলদানি, তাহার উপর সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া। দেওয়া-লের এক পার্শ্বে জাপানী বংশ নির্ম্মিত সুদৃশ্য ব্রাকেটের উপর কতক গুলি ছোট-বড় পুতুল। দুইটি মেহগ্নি কাষ্ঠের আলমারীতে সুন্দর কতকগুলি বাঁধান পুস্তক। মুক্ত বায়ু গৃহ হইতে একটা সুস্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল।

আমি মুগ্ধ নেত্রে গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে মনে মনে গৃহস্বামীর ধনশালিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম! সহসা গৃহস্থিত একখানা সোফার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল ;—দেখিলাম, অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থান করিয়া এক সুন্দরী কিশোরী পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার তরঙ্গায়িত নিবিড় ঘন-কৃষ্ণ কুন্তলরাজি সোফার বাহিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রমণী সুন্দরী, খুব সুন্দরী, সচরাচর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না, অন্তত আমার জীবনে আর কখনও তেমন সুন্দরী দেখি নাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি।

আমার যদি তখন প্রেমে পড়িবার অবসর থাকিত, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তের দর্শনে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিত, কে জানে, কিন্তু আমার মনের গতিটা তখন ঠিক প্রণয়ের উপযোগী ছিল না। রমণীকে দেখিয়া আমি এমন ভীত হইয়াছিলাম যে ছাত্রজীবনে পাঠশালার বেত্র-হস্ত গুরুমহাশয়কে দেখিয়াও বোধ হয় কখনও তেমন ভীত হই নাই। রমণী যদি আমায় দেখিয়া ফেলেন? ছি! ছি! তিনি কি আমায় নিতান্ত একটা বখা ছোকরা ভাবিবেন না? নিশ্চয়ই তিনি মনে করিবেন, আমি শুধু তাঁহাকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম! লজ্জিত বিরক্ত চিত্তে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আমার ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়, হার্ম্মোনিয়ম কিম্বা পিয়ানো-সংযোগে ঠিক বলিতে পারি না, কারণ সঙ্গীত-বাদ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—সুমিষ্ট নারী-কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের নীরস নির্জ্জীব মেসটাও ক্ষণকালের জন্য যেন সরস হইয়া উঠিল। গান শুনিয়া অনেকেই অনেক রূপ মন্তব্য

প্রকাশ করিলেন। প্রকাশদা' হাসিয়া বলিলেন, "ভাই হিরু, ব্যাপারটা কি, বল্ দেখি?" আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম, "ব্যাপার ত দেখতেই পাচ্ছ। গাচ্ছে কে, বল দেখি?"

প্রকাশ দা রহস্যের সুরে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গলা বলেই ত মনে হচ্চে! তোর সঙ্গে আলাপ হয়েচে নাকি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যাও, আলাপ কেন হবে? আমি কিন্তু দেখেচি, সে দেখ্‌তে ঠিক্,—না আমি বল্‌ব না।"

প্রকাশ দা একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওঃ বুঝেচি, সে দেখ্‌তে একেবারে পরী! না? কিন্তু দেখিস ভাই, প্রেমে-ট্রেমে যেন পড়ে যাস্ নি, সাবধান! উপস্থিত পরীক্ষার প্রেমে পড়াটাই বেশী দরকার।"

আমি ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলাম, "যাও, যাও, তোমায় আর চালাকি কর্‌তে হবে না, তুমি নিজে সাবধান হয়ো।"

তাহার পর আর তাঁহাকে দেখি নাই। যদিও তাঁহার জানালা প্রায়ই খোলা থাকিত, তথাপি তাঁহাকে কোনদিন আর দেখিতে পাই নাই। অবশ্য আমারও তাঁহাকে দেখিবার কোন চেষ্টা ছিল না। সময় সময় অলঙ্কারের মৃদু সিঞ্জন-ধ্বনির সহিত আমাদের সম্মুখে মুক্ত গবাক্ষ তরুণীর আগমন জ্ঞাপন করিয়াই রুদ্ধ হইয়া যাইত। সে বৎসর আমাদের বি, এ, একজামিন। আমি তখন বিপুল মনোযোগের সহিত পড়িতে ব্যস্ত। প্রতিবেশিনী রূপসী তরুণীর খবর লইবার কাজেই আমার তখন ইচ্ছা বা অবসর, কিছুই ছিল না। কিন্তু প্রকাশদা' তবু আমায় সুযোগ পাইলেই সুন্দরীর সম্বন্ধে তামাসা করিতে ছাড়িতেন না। যদিও বুঝিতাম, সর্ব্বদা আপনার অবস্থা স্মরণ রাখাইবার জন্য এটা শুধু

সতর্ক স্নেহের উপদেশ, তবুও কেমন এ রকম তামাসা আমার ভাল লাগিত না। একদিন কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, জানি না, মনে মনে স্থির করিলাম, প্রকাশ দাকে জব্দ করিব। আমার অপরাধ, আমি সেই সুন্দরীকে একদিন দেখিয়াছি ইহাই ত! দুষ্ট ইচ্ছা-সাধনে সুযোগের অভাব হয় না। আমারও হইল না। অচিরে সুযোগ মিলিল।

সে দিন বৈকালে সবে মাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়াছি, দেখিলাম, গুপ্তসাহেবের বাটির জানালা খোলা এবং গৃহাধিকারিণী সুন্দরীও নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ-নিমগ্না। নিঃশব্দে প্রকাশদা'র ঘরে গেলাম। তিনি সবেমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "প্রকাশ দা, একবার শীগ্‌গির এস ত, একটা পাখী ধরব, গোল করো না, যেন।" এত বয়সেও আমার ছেলে-মানুষি না যাওয়ার জন্য তিনি মৃদু তিরস্কারের সূচনা করিতেছিলেন,—আমি তাহাতে বাধা দিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিলাম।

গৃহে প্রবেশ-মাত্রেই তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখের খোলা জানালায় পতিত হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি তখন সুন্দরীর সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল, আলুলায়িত কেশদামে ভূষিতা অনিন্দনীয়া তরুণী-মূর্ত্তি ভাস্বর প্রতিমার মতই মনে হইতেছিল! আমার মনে পড়িয়া গেল, বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলাকে,—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" যদিও এই সুন্দরী নারীতে তপস্বিনী বা বনবাসিনীর দুরবস্থার কোন চিহ্নই ছিল না, তথাপি এ ছবি উপন্যাসে স্থান পাইবার যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত,

তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সুচিক্কণ হরিদ্রা বর্ণের রেশমী বস্ত্র তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এইবার প্রকাশদা—আর আমার সঙ্গে লাগ্‌বে?" অত্যধিক আনন্দের উত্তেজনায় কণ্ঠ-স্বরের মৃদুতা রক্ষা করিতে আমি ভুলিয়া গেলাম। সহসা দুইটি উজ্জ্বল কালো চোখের ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের উভয় অপরাধীর মুখে পতিত হইল। কিশোরী একবার মাত্র নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়াই, উঠিয়া গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর আমরা দুইটি বি, এ, ক্লাশের ছাত্র লজ্জায় মরিয়া গিয়া পরস্পরের মুখের দিকে যে চাহিতে পারি নাই তাহা বেশ মনে আছে। প্রকাশ দা' নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে বলিলেন, "ছি, ছি, হিরু, ভাল কাজ করলে না!" আমিও তাহা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়াছিলাম,—কিন্তু তখন আর বুঝিলে ফল কি?

মানুষ সহজে নিজের দোষ স্বীকার করিতে ভালবাসে না। মনে মনে আপনার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিলেও প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলাম, "বাঃ, আমার বুঝি দোষ হল! তুমি দেখ্‌লে, কেন?" হায়! কে জানিত, সেই এক মুহূর্ত্তের অবিবেচনা জীবন-ব্যাপী অনুশোচনার কারণ হইয়া রহিবে!

২

এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সে জানালা আর খুলিতে দেখি না—না খুলিলেই ভাল! কিন্তু সেই দিন হইতে প্রকাশদার যেন কেমন একটু পরিবর্ত্তিত ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি যেন সর্ব্বদাই গম্ভীর, চিন্তাকুল! যেন কি এক অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধানে উৎসুক।

তাঁহার চির-প্রসন্ন হাস্যময় বদন যেন বিষাদের একটা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বা একান্ত চিন্তাকুল, আবার কখনও বা নয়নে অর্থহীন দৃষ্টি! একদিন কথাপ্রসঙ্গে ইতস্তত করিয়া তাঁহার এই পরিবর্ত্তিত ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রকাশদা উত্তর দিলেন, শরীর খারাপ, তাই কিছু ভাল লাগে না। আমিও নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছাড়িয়া পড়ায় মন দিলাম।

একদিন কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া দেখি, প্রকাশদা' জ্বর করিয়া পূর্ব্বেই ফিরিয়াছেন। মেসের চাকর শিবু বলিল, "বাবুর যে শরীরের উপর অগ্রাহ্যি! কাল সারা রাত ছাদে বেড়িয়েছেন, তা আর জ্বর হবে না? এই ভাদ্দুরে হিম কি আপনাদের ভদ্দরলোকদের বরদাস্তি হয়?"

তাড়াতাড়ি বইগুলা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া প্রকাশদার ঘরে ছুটিলাম। জ্বরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরে আসিয়াই শিবুকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। বিদেশে আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থাতেও প্রকাশদা'র চিকিৎসা বা সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। মেসের সমস্ত ভদ্রলোকই যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিলেন— পালা করিয়া রাত্রি জাগরণ, সমস্তই চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সকলেই পরের চাকর, এজন্য ইচ্ছা থাকিলেও অফিস কামাই করিতে পারেন না। ত আমি কয়দিন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র তাঁহার নিকটেই বসিয়া রহিলাম।

প্রকাশদা' আমা-অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। তিনি আমায় ঠিক নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকাশের মতই স্নেহ-যত্ন করিতেন। তাঁহার

অসুখে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। কেহ কেহ বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইতে বলিলেন ; কিন্তু অনেকে আবার আপত্তি করিলেন। প্রকাশদার বাটীতে তাঁহার বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকাশ ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। এ অবস্থায় তাঁহাদের সংবাদ দেওয়া শুধু বিপন্ন করা,—কোনরূপ সাহায্য-প্রাপ্তির আশা অল্পই।

সতের দিনের দিন প্রকাশদার জ্বর একেবারেই ছাড়িয়া গেল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে মনে ঈশ্বরের অসীম করুণার জন্য প্রণাম করিলাম! প্রকাশদা'র অসুখে অনেকদিন আমার কলেজ কামাই হইয়াছিল। সে দিন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত চিত্তে কলেজ গেলাম। পীড়িত অবস্থায় প্রকাশদা'কে আমার ঘরেই রাখিয়াছিলাম, কারণ, আমার ঘরটিই অপেক্ষাকৃত খালি ছিল। প্রকাশদা'র ঘরে আমাদের দুইজনের স্থান হইত না।

কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, প্রকাশদা বালিশে হেলান দিয়া একখানা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছেন। আমায় দেখিয়া কাগজখানা বিছানার উপর ফেলিয়া বলিলেন, "হিরু, এসেচ, এতক্ষণ একলাটি যেন একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল।"

আমি বলিলাম, "আমারও বড় ভয় হচ্ছিল, বাড়ী গিয়ে আবার না জানি, তোমায় কেমন দেখ্‌ব!" তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তোর ধার আমি জন্মেও শুধ্‌তে পার্‌ব না, হিরু, তুই আমার মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও বেশী।" তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আমারও শুষ্ক ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইবার ইচ্ছায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলে প্রকাশদা বলিলেন, "হিরু দেখ ত, কোথা থেকে ফুলের গন্ধ আস্‌চে?" এ গন্ধ আরও বহুদিন আমি অনুভব করিয়াছি—তাই বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলাম, "ও দত্তসাহেবের বাড়ী থেকে আস্‌ছে!" আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম, "দেখ্‌তে বলছ! আমি কিন্তু আর ওদিকে চাচ্ছিনা—কাজ কি বাবু আদার ব্যাপারি জাহাজের খবরে?" প্রকাশদা কিছুই বলিলেন না। কিন্তু ক্ষণেকের জন্য তাঁহার রক্তহীন বিবর্ণ মুখও যেন শোণিতের উচ্ছ্বাসে আকর্ণ রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর একমাস কাটিয়া গেল। শরতের রৌদ্র-রঞ্জিত লঘু মেঘ-খণ্ডগুলি আকাশে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বিকশিত কাশগুচ্ছ নদীর কূলে শুভ্র বস্ত্র বিছাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত দেশ মহোৎসবের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শনিবার কলেজ হইয়া আমাদের পূজার ছুটি হইবে। সেদিন শুক্রবার, আত্মীয়-বন্ধুহীন বিদেশ ছাড়িয়া স্নেহময় প্রিয়জন-পূর্ণ স্বদেশে জনক-জননীর স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য প্রাণের মধ্যে যে কি ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, তাহা আমার মত ভুক্তভোগীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রকাশদা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য বাটী যাইতে রাজি হইলেন না। বিশেষত এই বৎসরেই আমাদের একজামিন্, অসুখের জন্য পড়াশুনার বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে—এখন নির্জ্জন-বাসে সেইটুকু যথাসাধ্য পোষাইয়া লইবেন। সুতরাং কোন আপত্তি খাটিল না।

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেছি, প্রকাশদা' আসিয়া বলিলেন, "হিরু, কাল সুবিধা হবে না

বলে আজই জিনিষগুলা কিনে নিয়ে এলুম, মাকে এইগুলো দিও।” বলিয়া কাপড় প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য তিনি টেবিলের উপর রাখিলেন, তারপর পকেট হইতে একটি সুন্দর এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া বলিলেন, “এইটি তোমার পূজার উপহার! গরীব দাদা—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “যাও, যাও, আর চালাকি কর্ত্তে হবে না।” বিনা আপত্তিতে শিশিটি পকেটস্থ করিলাম। প্রকাশদাকে আমার খালি ঘরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যথাসময়ে যাত্রা করিলাম।

যাত্রাকালে একবার ইচ্ছা করিয়াই দত্ত সাহেবের বাড়ীর জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঈষন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে দুইটি উজ্জল কৃষ্ণ চক্ষু বোধ হয় আমার বিদায়-আয়োজন দেখিতেছিল! আমি চাহিবামাত্র মৃদু-মধুর চুড়ির শব্দের সহিত গবাক্ষ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রকাশদা'র দিকে চাহিলাম, তিনি তখন নত নেত্রে বন্ধুপত্নী-দত্ত জুতার রেশম-নির্ম্মিত পুষ্প-পত্রের মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, কোন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ মনোযোগী ছাত্রও বোধ হয় তেমনভাবে পুষ্প-পরাগের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট-চিত্ত হইতে পারে না।

প্রকাশদা ষ্টেশনে আমার সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে আমায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ট্রেন ছাড়িলেও যতদূর দৃষ্টি চলে, আমি মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম, তিনি স্নেহ-পূর্ণ নেত্রে আমারই দিকে চাহিয়া!

পূজার পর ক্রমে ছুটী ফুরাইল। আমারও কলিকাতায় ফিরিবার সময় আসিল। পিশিমা—প্রকাশদা'র মা, কয়দিনই আমাদের বাড়ী আসিয়া মাথার দিব্য দিয়া প্রকাশদাকে বিশেষ সাবধানে থাকিবার জন্য বলিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। আরও বলিলেন, হরকুমার

দত্তর মেজ মেয়ে পান্নামতির সহিত তিনি প্রকাশদার বিবাহের সমস্তই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। মেয়েটি বড় ঠাণ্ডা, বেশ নরম-নরম গড়ন—তারা দেবে-থোবেও ভাল। এবার কোন "ওজোর-আপত্যি" তিনি শুনিবেন না। "ভারতে এসে" মেয়ে-জন্মের কোন সাধই তাঁর পূর্ণ হয় নাই! প্রকাশদা' যদি এ বিয়ে না করে, তাহা হইলে তিনি যে নিশ্চিত কাশীবাসিনী হইবেন, এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। পিশিমার স্বহস্ত-প্রস্তুত 'মুগের পিঠার' সদ্ব্যবহার করিতে করিতে বিনা প্রতিবাদে তাঁহার সকল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "দৌত্য"-ভার গ্রহণ করিলাম।

আত্মীয়-বন্ধুদের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন কাটাইয়া কর্ত্তব্যের পথে আবার যাত্রা করিলাম। কলেজ খুলিতে একদিন মাত্র বাকী!

ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই দুইটি স্নেহপূর্ণ "চশমা-মণ্ডিত" চক্ষু এবং একখানি হাস্যোজ্জ্বল প্রীতিপূর্ণ মুখ দেখিবার জন্য গাড়ির জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিলাম। কৈ? প্রকাশদা ত আসেন নাই! আমি পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে পত্রদ্বারা সংবাদ জানাইয়াছি। তবে কি আবার কোন অসুখ-বিসুখ হইল, না, কি?

বাসার নিকটেই গুপ্তসাহেবের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাড়ী-বারাণ্ডায় খানকয়েক বড় বড় জুড়ি, ব্রুহাম, বেরুচ প্রভৃতি নানা জাতীয় গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। লোক-জনও সব ছুটাছুটি করিতেছে! ব্যাপার কি, বুঝিলাম না—বোধ হয়, ভোজের আয়োজন! কারণ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার বাড়ী দেশী ও বিলাতী, সাদা ও কালার মিশ্র শুভাগমনে পবিত্র হইত।

বাসায় ঢুকিতেই শিবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তখন বাবুদের

ফরমাস-মত পাঁঠার সন্ধানে বাজারে যাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রকাশদা' ভাল আছেন এবং বাসাতেই আছেন। শুনিয়া মনে একটু অভিমানের উদ্রেক হইল। প্রকাশদা' তাহা হইলে পূর্ব্বের মত আমাকে আর ভালবাসেন না! কিন্তু শীঘ্রই সে অভিমান দূর হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিতেই দেখি, টেবিলের উপর রাশীকৃত পুস্তক ছড়াইয়া প্রকাশদা' দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। এতদূর চিন্তিত যে, আমার সশব্দ গৃহ-প্রবেশেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না।

কাছে গিয়া দেখিলাম, বইগুলি সবই ডাক্তারি। প্রকাশদা' ডাক্তারি শিখিবেন না কি? আমি ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলাম, "প্রকাশ দা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মত তিনি আমার মুখের পানে চাহিলেন। এই একমাসে প্রকাশদা'র শরীরে যেরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দীর্ঘ কাল রোগ-ভোগেও তাঁহার চেহারা তেমন খারাপ হয় নাই। উন্নত, সরল, সুঠাম দীর্ঘ দেহ ঝটিকাহত বিটপীর মত হেলিয়া পড়িয়াছে। বর্ণেও সে উজ্জ্বলতা নাই।

"হিরু, এলি ভাই। আবার আমার শরীর এমন খারাপ হয়েচে যে, ষ্টেশনে তোমায় আন্‌তে যেতে পারিনি।" আমি দুঃখিত-ভাবে বলিলাম "সেজন্যে ত কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু তোমার শরীরের এই অবস্থা, অথচ আমি প্রত্যেক চিঠিতে তুমি ভাল আছ সংবাদ পেয়েচি?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রকাশদা উত্তর দিলেন, "ভাল থাকার কথা বলচ! তা ভালই আমি ছিলেম, এই আজই শরীরটা একটু কেমন বোধ হচ্ছে যেন।"

আমি ব্যথিত স্বরে বলিলাম, "প্রকাশদা আমায় তুমি লুকুচ্চ? তুমি যে কেমন ছিলে, তা কি আমি তোমায় দেখেই বুঝতে পার্চ্ছিনে! তোমার ঐ ছোট আরসিখানাকে জিগ্যেস কর্‌লে সেও যে ব্‌লে দেবে—"

"না হিরু, আমার অসুখ এমন কিছু নয়" বলিয়াই তিনি গৃহের কথা, মার কথা, ছোট ভাই বিকাশের পড়াশুনার কথা, আমাদের বাড়ী এবং পাড়া-প্রতিবাসীর সংবাদের জন্য এমনই অযথা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াই চুপ করিয়া রহিলাম। প্রকাশদা'র মা যে বিশেষভাবে তাঁহার বিবাহের কথা জানাইয়া ছিলেন, সে কথার উল্লেখ মাত্র করিলাম না। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথা জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে আহারের স্থানে প্রকাশদা'কে দেখিতে না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বামুন ঠাকুর বলিল, তাঁর শরীর খারাপ, তিনি আজ আহার করিবেন না, বলিয়া দিয়াছিলেন! মেসের অধ্যক্ষ বিপিন বাবু বলিলেন," প্রকাশবাবুর আজকাল নিত্যই ঘুষঘুষে জ্বর হয়—আহার ত অর্দ্ধেক দিনই বন্ধ যায়। ডাক্তার ডাকবার কথা বললে ওষুধ-বিসুদের কথা জিগ্যেস করলে হাসেন, বলেন; তিনি নিজেই এখন ডাক্তারি শিখচেন! হীরালাল বাবু এসেচেন, এই সময় ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন!"

শয়নের পূর্ব্বে প্রকাশদার ঘরে গেলাম। তাঁহাকে নিদ্রিত বলিয়াই অনুমান হইল। না জাগাইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলাম।

কত রাত্রে ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয়, রাত্রি তখন আড়াইটা হইবে, একটা ভীষণ কোলাহলে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বিছানায় উঠিয়া

বসিলাম। অন্ধকারে চুপ করিয়া পড়িয়া শুনিতে লাগিলাম, শব্দ বাড়িতে লাগিল। কারণ জানিবার জন্য অন্ধকার হাতড়াইয়া বাহিরে আসিবার সময় অসতর্ক হাত লাগিয়া প্রকাশদার স্নেহের উপহার এসেন্সের শিশিটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আকস্মিক ক্ষতিতে বিরক্তি বোধ হইলেও তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম।

গোলযোগে মেসের সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। কেবল প্রকাশদাকে দেখিলাম না। বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম, গুপ্তসাহেবের বাড়ী হইতেই একটা ভয়ানক ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সকলেই হায়, হায় করিতেছে। শুনিলাম, গুপ্ত সাহেবের শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা প্রভাবতী আর ইহলোকে নাই। হৃদয়ে দারুণ আঘাত অনুভব করিলাম। সেই সুন্দরী, লোক-ললামভূতা লাবণ্যময়ী কুমারী,—এত অল্প বয়সেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল! শুনিলাম, দত্ত সাহেবের চারি পুত্র এবং কন্যা ঐ একটি। মেয়েটি এতদিন লরেটোতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, সম্প্রতি কয়েক মাস হইলে, স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য বাটি আসিয়াছিলেন। ডাক্তাররা বলেন, অল্প বয়সে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমেই রোগের উৎপত্তি। রোগটা ডিসপেপ্‌সিয়া এবং অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য। কন্যার চিকিৎসায় ধনী পিতা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতায় যাবতীয় সাহেব-বাঙ্গালী প্রধান চিকিৎসকগণকে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়াছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্য তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিল। জনক-জননীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বর্গের ফুল ভালরূপে না ফুটিতেই অকালে ঝরিয়া গেল!

সে রাত্রে কাহারও নিদ্রা হইল না। প্রকাশদা' কিন্তু স্বচ্ছন্দে আপনার

রুদ্ধ কক্ষে নিদ্রা-মগ্ন! তাঁহার গৃহসঙ্গী কেরাণীটিও এ সময় অনুপস্থিত, সুতরাং তাঁহার নির্জ্জন নিদ্রাসুখে ব্যাঘাত জন্মাইবে, এমন কেহ ছিল না। বাবুরা প্রকাশদার কুম্ভকর্ণ নিদ্রার সম্বন্ধে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু সত্যই কি তিনি নিদ্রিত? একটা প্রবল সম্ভাবনার কথা আমার ব্যথিত চিত্তকে বারবার ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

ভোর না হইতেই প্রকাশদা'র ঘরে গেলাম! তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার দূর হয় নাই—নবীন রবির স্নিগ্ধ কিরণ প্রাসাদ-সমূহের ধূম্রমলিন উচ্চ চিমনীর শীর্ষ দেশ স্পর্শ করে নাই! রাস্তায় তখনও বিড়েবাড়ন, গরম চা, মনোমোহিনী টিপ, চিনে সিঁদূর প্রভৃতি শ্রুতিমধুর শব্দ শুনা যাইতে ছিল না। ঘরের সকল জানালা খোলা! তাহার মধ্য দিয়া ভোরের বাতাস শৈত্য বহন করিয়া শরীরকে স্নিগ্ধ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছিল। ঘরে ঢুকিতেই অভ্যাসমত দত্ত সাহেবের বাড়ীর জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল। খোলা জানালায়, লেশ-সংযুক্ত নেটের পর্দ্দার ভিতর দিয়া গৃহস্থিত দ্রব্যাদি যথাযথ দেখা যাইতেছিল। সমস্ত ঠিক আছে। কেবল সেই সকলের অধিকারিণী সেই সুন্দরী,—তিনি আজ কোথায়?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশদার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তিনি তখন রাশী-কৃত কাগজ-পত্র, কাপড়-চোপড় ছড়াইয়া ট্রাঙ্ক গুছাইতেছিলেন! আমায় দেখিয়া বলিলেন, "হিরু, কাল তোমায় বলা হয়নি—আমায় এখনি এলাহাবাদ রওনা হতে হবে।" আকাশ হইতে পড়িলাম! বিস্মিত ভাব গোপন না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "কারণ?" প্রকাশদা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন, "কারণ, এমন কিছুই নয়!—হাঁ, কি বলছিলুম, কারণ

আছে বৈ কি! কাল হরিবাবুর চিঠি পেয়েছি, তাঁর বড় অসুখ! তিনি আমায় যেতে লিখেছেন!”

হরিহর বাবু প্রকাশদা'র বন্ধু। কিন্তু এতকাল তাঁহার প্রতি প্রকাশদা'র কোনরূপ প্রবল স্নেহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই! আজ সহসা তাঁহার অসুখের জন্য এই অচিরাগত একজামিনের পড়া বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবার যে বিশেষ প্রয়োজন পড়িল, কেন, তাহা বুঝিলাম না। তথাপি কোন উত্তর দিলাম না।

বন্ধুদর্শনেচ্ছা যতই প্রবল থাকুক, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। এটুকু অভিজ্ঞতা যদি না থাকে, তবে বৃথা আমি তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া গর্ব্ব করি! অনিদ্রা-কাতর, রোদন-আরক্ত মলিন মুখ, শরীরের শোচনীয় দীনতা আমার সন্দেহটুকুকে সত্যে পরিণত করিতেছিল। আমায় নির্ব্বাক দেখিয়া প্রকাশদা' অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “তুমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস কর? আমি করি! কাল রাত্রে তিনি এসেছিলেন। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ঠিক ঐ খানেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।”

কাহার কথা, বুঝিলাম, কিন্তু উত্তর দিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, “সত্যই তিনি এসেছিলেন! এখনও আমি তাঁর অঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব কচ্ছি।”

বাধা দিয়া বলিলাম, “না প্রকাশদা, তুমি ভুল কচ্ছ! কাল রাতে অসাবধানে আমার এসেন্সের শিশিটা ভেঙ্গে গেছে, এ তার গন্ধ— এখনও আমার কাপড়টা যেন ভিজে-ভিজে রয়েছে।”

প্রকাশদা অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বুঝিলাম, আমার কথাগুলা তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলেও হৃদয়ে পৌঁছায় নাই।

একজামিনের অদূরবর্ত্তিতা দেখাইয়া তাঁহার পশ্চিম-যাত্রায় আপত্তি প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, "পড়া-শোনা সেখানেই বা না হবে, কেন? বিশেষ হরিবাবু যখন পীড়িত, আর তিনি যখন আমাকে ডেকেছেন, তখন, ইত্যাদি।"

কোনমতে সঙ্কোচ দূর করিয়া সন্তর্পণে মৃতা সুন্দরীর কথা উত্থাপন করিলে বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া প্রকাশদা উত্তর দিলেন, "পাগল! আমি কি সে জন্য যাচ্ছি? সে আমার কে?—" কথাটা বলিতে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল,—"সূর্য্য-জ্যোতি জগতের জীবন, চন্দ্রকর পৃথিবীর আনন্দের মূল হলেও তাদের ধরবার সাধ পাগল ছাড়া আর কার হয়?" এ কথার কি উত্তর দিব? বিশেষত আমি তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতাম; বয়স্যের ভাবে নয়। ভাবিলাম, পশ্চিমের জলবায়ু হয় ত তাঁহার স্বাস্থ্য-উদ্ধারে সমর্থ হইবে! এই টুকুই এখনকার সান্ত্বনা।

সেই দিনই রাত্রি নয়টার ট্রেনে প্রকাশদা এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। বিদায়কালে তাঁহার সেই বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি শেলের মত আমার বুকে বিঁধিতেছিল। তাঁহার এ অকারণ মর্ম্মবেদনার জন্য দায়ী কে? কেন তাঁহার যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-মণ্ডিত তরুণ হৃদয়ে রবি-কিরণোদ্ভাসিতা মহিমময়ী লাবণ্যের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলাম? জীবন-ব্যাপী অনুতাপেও কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

বলিবার কথা বড় বেশী নাই। তার পর সুদীর্ঘ সাত বৎসর

কাটিয়া গিয়াছে। প্রকাশদা এখন বেরিলিতে ওকালতি করেন। তিন বৎসর হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। ছোট ভাইটি এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রকাশদা আজিও অবিবাহিত। বিকাশের বিবাহের জন্য পাত্রী দেখা হইতেছে। প্রকাশদা চিরদিন অবিবাহিত থাকিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বিবাহে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই! তাঁহার এই অকারণ অকাল-বৈরাগ্যের জন্য প্রতিবাসী-আত্মীয়-বন্ধু সকলেই বিশেষ দুঃখিত, বিশেষত কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতৃকুল! কিন্তু আমার দুঃখ,—তাঁহার অতীত আমি জানি! আমারই অবিবেচনার ফলে তাঁহার জীবনের সুখ-স্বপ্ন বিফল হইয়া গিয়াছে! এ ভুলের সংশোধন নাই!

উপেক্ষিতা

"মণিদা—তুমি নাকি বিলেত যাবে? সাহেব ডাক্তার হবে?"

অস্ত-গমনের পূর্ব্বে সূর্য্য তখন আপনার সমস্ত কিরণটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে বায়ু একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়া একটা গুমটের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। ছোট ঘরে জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের সেই রৌদ্র-ঝলসিত গাছ-পালার দিকে একবার চাহিয়া, মুখ ফিরাইয়া, প্রশ্নকারিণী বালিকা ছাত্রীর প্রতি চাহিয়া মণীন্দ্র কহিল, "হাঁ মিনু, আমি বিলেত যাব,—এই বৃহস্পতিবারেই যাব।"

"বৃহস্পতিবার? কেন, তুমি বিলেত যাবে, মণিদা? হারুকাকা বলছিল, বিলেত গেলে জাত যায়, সাহেব হয়! আর—"কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই বালিকা মুখ ফিরাইল, শিক্ষকের বিশৃঙ্খল পুস্তকাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে মনঃ-সংযোগ করিল। মৃণ্ময়ীর কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতায় মণীন্দ্র বুঝিয়াছিল—সে কেবল অশ্রু-সম্বরণের জন্যই মুখ ফিরাইয়াছে! তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। সেও এতক্ষণ এই কথা ভাবিতেছিল—বিলাত গিয়া কি হইবে? কিন্তু পূর্ব্বে কতদিন নির্জ্জনে ভগবানের নিকট মণীন্দ্র এই শুভ দিনের জন্যই কত প্রার্থনা করিয়াছে, আপনার নিঃস্ব জীবনে শত ধিক্কার দিয়া ভাবিয়াছে, তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। আজ যখন অপ্রত্যাশিতরূপে জীবনের সেই একান্ত-প্রার্থনীয় দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত আয়ত্তে আসিল, তখন

মণীন্দ্রর মনে হইল, বুঝি এ মুহূর্ত্ত না আসিলেই ভাল হইত! কি প্রয়োজন ছিল? না,—প্রয়োজন আছে বৈ কি! কয়টা বৎসর বই ত নয়,—দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তারপর সে যখন কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিবে, সে দিন! কল্পনায় ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মণীন্দ্রকে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত করিল। কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তবে ফিরিয়া সে দেখিল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ঘর অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে, এবং ছাত্রী মৃণ্ময়ী তাহার অসমাপ্ত উত্তরের আশা না রাখিয়াই কখন্ চলিয়া গিয়াছে!

দেশের জমিদার বিপিনচন্দ্র বসু মণীন্দ্রকে পুত্র-তুল্য স্নেহ করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে সে আজ মেডিকেল কলেজে পাঠ সমাপনান্তে এম, বি, উপাধি লাভ করিয়া লোকের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। দেশে মশা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ছোট-বড় অনেকগুলি উপদ্রব বর্ত্তমান থাকায় বিপিন বাবু সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহার বহুবাজারের বাটিতে বাস করিতেন। মণীন্দ্র তাঁহার নিকটে থাকিয়াই মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িত।

নিজের পড়াশুনা ছাড়া মণীন্দ্রের আর একটি কাজ ছিল—প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বিপিন বাবুর একমাত্র কন্যা মৃণ্ময়ীকে সে শিক্ষাদান করিত। সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টাই মণীন্দ্রর পক্ষে একান্ত লোভনীয় ছিল। আবাল্য একত্র পালিত হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

মণীন্দ্রর এক দূর-সম্পর্কীয় ধনী জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে কখনও ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ লন নাই। তাঁহার মৃত্যুর

পর অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সকলে শুনিল যে, সেই অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাত উইল করিয়া তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকেই দান করিয়া গিয়াছেন! উইলের কিন্তু একটি সর্ত্ত ছিল, মণীন্দ্রকে বিলাত যাইয়া ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হইবে!

সাধু-চরিত্র মণীন্দ্রর এই আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনে সকলেই আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। মণীন্দ্রর বিলাত-গমনে আগ্রহ দেখিয়া বিপিন বাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও এতটুকু আপত্তি প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু এই ব্যাপারে সব-চেয়ে গোলে পড়িল, মৃণ্ময়ী। সে দেখে, তাহার মণিদা আজকাল সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, বিষম ব্যস্ত! সে আর যখন-তখন ইচ্ছামত তাহার দখল পায় না। গ্রীষ্মের রাত্রে আহারাদির পর দক্ষিণের খোলা বারাণ্ডায় মাতা অন্নপূর্ণার নিকট শয়ন করিয়া ইংরাজী-বাঙ্গালা নানা গ্রন্থ হইতে গল্প শুনা ত একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে!

লেখাপড়ায় মৃণ্ময়ীর কোন দিনই অনুরাগ ছিল না, আজকাল নাকি অন্য সময় মণীন্দ্রর দেখা পাওয়া যায় না, তাই সে অত্যন্ত আড়ম্বর করিয়া পড়িতে বসে, কিন্তু মণীন্দ্রর এতই কাজ যে, সে ছাত্রীর এই আকস্মিক পাঠানুরাগ অনুভবও করিতে পারে না। সংক্ষেপে পড়া বুঝাইয়া সে আপনার কাযেই মন দেয়। অভিমানে বালিকার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, কাল আর কখনই পড়িতে আসিবে না! কিন্তু পরদিন দেখা যায়, যথাসময়ের পূর্ব্বে, মণীন্দ্রর ডাকিবার অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া নির্লজ্জা বালিকা পিঠে বিনুনী ঝুলাইয়া শ্লেট-বই সম্মুখে রাখিয়া পাঠ মুখস্থ করিতে লাগিয়া গিয়াছে!

২

বিদায়ের পূর্ব্বে মণীন্দ্র মৃণ্ময়ীর অন্বেষণে গিয়া দেখিল, সে পড়িবার ঘরে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। "মিনু, আমার যাবার সময় হয়ে এল, তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে খুঁজতে এলাম, এখানে একলা কি করছ?"

মৃণ্ময়ী কোন উত্তর দিল না, তেমনই বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

"মিনু, আশা করি, আমি চলে গেলেও তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দেবে না! আমার বড় সাধ ছিল, তোমায় খুব লেখাপড়া শেখাব।" মৃণ্ময়ী ফিরিয়া চাহিল, মণীন্দ্রকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল, কিন্তু একটিও কথা বলিতে পারিল না। মণীন্দ্র দেখিল, অজস্র অশ্রুপাতে তাহার চক্ষু স্ফীত, রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে! তখনও মুক্তার বিন্দুর মত অশ্রু ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছিল। ব্যথিত মণীন্দ্র বালিকার হাত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "কেঁদো না মিনু, ক'টা বছর দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। পৌঁছেই আমি তোমায় চিঠি দোব, তুমি লিখবে ত?"

মৃণ্ময়ী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, লিখিবে!

"পড়াশুনা ছেড়ে দিও না মিনু। তবে আমি আসি—।" হাত ছাড়িয়া মণীন্দ্র বাহিরে গেল। মৃণ্ময়ী মাটিতে লুটাইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া মণীন্দ্রও চক্ষু মুছিল।

বিলাতে পৌঁছিয়া মণীন্দ্র বিপিন বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার সহিত মৃণ্ময়ীকেও সে একখানি পত্র দিয়াছিল। চিঠিতে বিলাতের বর্ণনাই অধিক, আর লেখাপড়া শিখিবার জন্য উপদেশ! চিঠির শেষভাগে লেখা

ছিল, সে যখন দেশে ফিরিবে, মিনু তখন তাহার মণিদাদাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীই দেখিতে পাইবে।

যথাকালে বিপিন বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। প্রত্যাশিত নেত্রে মণীন্দ্র একখানি চিরপরিচিত হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের পত্র খুঁজিতেছিল। ঈপ্সিত বস্তু না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বিপিন বাবুর পত্র খুলিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল। খানিকটা পড়িতেই মণীন্দ্রর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। চিঠিতে বিপিন বাবু তাঁহার সফলতার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, আর মণীন্দ্রকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার অনুমতি চাহিয়াছেন। মণীন্দ্রর সম্মতি বুঝিলে তিনি লোক-নিন্দা উপেক্ষা করিয়াও কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে প্রস্তুত আছেন। তবে কথাটা রীতিমত পাকাপাকি করিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন!

পত্রোত্তরে মণীন্দ্র তাহার পিতৃতুল্য স্নেহময় আশ্রয়দাতার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার অসীম অনুগ্রহপূর্ণ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

৩

এক মাস, দুই মাস করিয়া মণীন্দ্রর বিলাত যাইবার পর দীর্ঘ দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে নিয়মিত প্রতি মেলে বিপিন বাবুর নিকট হইতে মণীন্দ্র পত্র পাইয়াছে ও তাঁহার সে পত্রের সে উত্তর দিয়াছে। মিনুকে দুই একবার পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়াতে তাহাকে সে আর পত্র লিখে নাই। আসিবার দিন সন্ধ্যার মৃদু আলোকে অসম্বদ্ধ-কেশরাশিমণ্ডিতা মৃণ্ময়ীর সেই একান্ত কাতর ক্রন্দন মনে করিয়া মণীন্দ্র

কতদিন নির্জ্জনে চক্ষু মুছিয়াছে! এতদিনে হয়ত, মণীন্দ্রর অদর্শন-দুঃখ মৃণ্ময়ীর সহিয়া গিয়াছে! বিপিন বাবু লিখিয়াছেন, মিনুর আজকাল পড়াশুনায় ভারী উৎসাহ,—সে জিদ করিয়া একজন শিক্ষয়িত্রী রাখাইয়াছে। আনন্দোচ্ছ্বসিত মণীন্দ্র ভাবিল, "মিনু এখনও আমায় ভুলিয়া যায় নাই। আমার আগ্রহ-অনুরোধ রাখিবার জন্যই তাহার এ পরিশ্রম!" বিপিন বাবুর প্রত্যেক পত্রে মিনুর কথা কিছু-না-কিছু থাকিতই, মণীন্দ্র সেই অংশগুলি তৃষিত চিত্তে বারবার করিয়া পড়িত, পড়িয়া তৃপ্তি অনুভব করিত।

এই সময় একটা মেলে বিপিন বাবুর নিকট হইতে মণীন্দ্র কতকগুলি জিনিষ উপহার পাইল। সেই সঙ্গে তাঁহার নূতন তোলা একখানি পারিবারিক ফটো ছিল। বাগানের ধারে ঝিলের নিকট একটা পাথর বাঁধান বেদীর কাছে চেয়ারে বসিয়া বিপিন বাবু,—কন্যা ও স্ত্রী, তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। মণীন্দ্র দেখিল, দুই বৎসরে মৃণ্ময়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই পরিপুষ্টদেহা বালিকা, এখন তন্বঙ্গী কিশোরী! তাহার সদা-হাস্যময় চক্ষু, প্রসন্ন মুখ, ঈষৎ লজ্জা-নম্র,—সুগোল, সুগঠিত হস্তে কয়েকগাছি চুড়ি, ব্রোচ-নিবদ্ধ পার্শি সাড়ীর ফিতা-বসান পাড়টি ঘাড়ের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়াছে,—নির্ম্মল রেখাহীন ললাটে গুচ্ছ-গুচ্ছ কলো চুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। মণীন্দ্র মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। এই মিনু! তাহার বাল্যসঙ্গিনী, শিক্ষাজীবনে ছাত্রী, বাগ্দত্তা পত্নী, মৃণ্ময়ী—সে এত সুন্দর!

মণীন্দ্র মৃণ্ময়ীর একখানি ক্ষুদ্র ফটো তুলাইয়া আপনার লকেটে সেটি রাখিয়া দিল; বড় ছবিখানা বাঁধাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইল।

৪

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন মণীন্দ্রর অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছে। দত্ত পরিবারের সহিত তাহার আত্মীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিপিন বাবুর পত্র সে নিয়মিত পাইয়া থাকে,—কিন্তু সেজন্য আর পূর্ব্বকার মত আগ্রহ নাই! সম্প্রতি বিপিন বাবুর পত্রে সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ পাইল। অন্নপূর্ণা মৃত্যুর সময় ভাবী জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া তাহার হৃদয় দুঃখে চঞ্চল হইয়া উঠিল; দত্ত পরিবারের সান্ত্বনায় সে দুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করিল।

আজ-কাল তাহার সন্ধ্যাটা প্রায়ই মিঃ দত্তের গৃহে অতিবাহিত হইত। অর্দ্ধেক দিন মিঃ দত্তের সাগ্রহ অনুরোধে রাত্রে সেখানে আহারও করিতে হয়। আর মিস্ দত্তের সুধাসঙ্গীতে মণীন্দ্র আত্মহারা হইয়া উঠে, সমস্ত দুঃখ-জ্বালা ভুলিয়া যায়। মধ্যে কয়দিন অমিয়ার সামান্য জ্বর হওয়ায় তাহার ভ্রাতা নির্ম্মলের অনুরোধে মণীন্দ্রকেই চিকিৎসা-ভার লইতে হইয়াছিল। জ্বর যদিও ৯৯এর অধিক উঠিত না, তথাপি সাবধানের বিনাশ নাই, এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, ডাক্তার সাহেব রোগিণীকে নিয়মিত দুই বেলা দেখিতে আসিতেন।

এই সময় দত্তপরিবারে আর একজনের খুব খাতির-যত্ন চলিতেছিল। সে এক ব্যারিষ্টারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র, নাম সতীশচন্দ্র বসু। প্রথম দর্শন হইতেই লোকটার উপর মণীন্দ্রর কেমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রকাশ্য কারণ সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। মণীন্দ্র দেখিল, মিষ্টার দত্ত সতীশচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল, দেখিতেও সে সুপুরুষ! কিন্তু সব চেয়ে বিড়ম্বনা ছিল,

মিস্ দত্তের প্রতি তাহার অযাচিত অনুগ্রহ! কয়দিনের রোষ দমন করিয়া মণীন্দ্র একদিন নির্ম্মলের কাছে অভিযোগ আনিল, "সতীশ লোকটা কি রকমের, বল দেখি? আমার ত মোটেই ওকে ভাল বলে বোধ হয় না। মেয়েদের সামনে দাঁড়াবারও যোগ্যতা নেই, ওর।"

নির্ম্মল তাহার নীল চসমার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মণীন্দ্রকে দেখিয়া লইল, কহিল, "কেন? মিষ্টার বসু কথা-বার্ত্তায় বেশ অমায়িক ত! আর স্বভাবটাও ভাল! বাবা ওঁকে খুবই পছন্দ করেন। ওঁর সঙ্গে বোধ হয় শীঘ্রই অমিয়ার বিয়ের এনগেজ্‌মেণ্ট হবে। অমিয়ার নাকি তেমন মত নাই, তাই দেরী হচ্ছে।" নির্ম্মল আর একবার চশমার ভিতর দিয়া বন্ধুর মুখ দেখিয়া লইল। মণীন্দ্র স্তম্ভিত হইল। অমিয়ার ভাবী স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার কি বলিবার আছে? কিন্তু না,—মণীন্দ্র কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে পারিবে না। অমিয়া কখনই মিষ্টার বসুর পত্নী হইবে না! প্রায় এক সপ্তাহের পর মণীন্দ্র একদিন মিস্ দত্তের নিকট হইতে সুন্দর সুগন্ধি কাগজে পরিপাটি হস্তাক্ষরে লিখিত এক আগ্রহপূর্ণ পত্র পাইল। মুখের উপর হইতে অসজ্জিত চুলগুলা সরাইয়া ললাটের ঘাম মুছিয়া টেবিলের উপর হইতে মণীন্দ্র বহুবার-পঠিত পত্রখানা তুলিয়া লইল। অমিয়া লিখিয়াছে, "আপনি কয়দিন আসেন নাই কেন? আপনি না আসায় আমরা সকলেই দুঃখিত। মা বলিলেন, আজ রাত্রে নিশ্চয় এখানে আসিয়া আহার করিবেন।"

চিঠিখানা বুকের পকেটে রাখিয়া দৃঢ়সংকল্প মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। সপ্তাহ-ব্যাপী হৃদয়-যুদ্ধে কর্ত্তব্য সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।

৫

সংসারে আমরা সহজ সিদ্ধান্তে যাহা একেবারেই অসম্ভব মনে করি, অনেক সময় দেখা যায়, তাহাই সব চেয়ে সম্ভব। বিপিন বাবু দেখিলেন, মণীন্দ্র আর চিঠিপত্র লেখে না, যদি বা লেখে, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। পূর্ব্বের সেই সঙ্কোচহীন, সরল আত্মীয়তা আজ শুধু ভদ্রতার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। স্নেহময় পিতা কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি জানিতেন, দৃঢ়চিত্ত মৃণ্ময়ী মণীন্দ্রকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছে! বিপিনবাবু যে ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া তাহাকেই জামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন! ইহাতে ন্যায়ের ফাঁকি, বা যদির কথা মনের কোণেও যে রাখেন নাই। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তিনি যে মনে মনে নিশ্চিন্ত আছেন, সে শুধু মৃণ্ময়ীকে বাগ্দত্তা জানিয়াই! বাগ্দত্তা কন্যা উৎসর্গিত ফুল, এই শিক্ষাই তিনি কন্যাকে আবাল্য দিয়া আসিয়াছেন। সাবিত্রী আপনার অদৃষ্ট-ফল জানিয়াই অল্পায়ু রাজকুমারকে বরণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি সত্যবানকেই হৃদয়ে পতির আসন দিয়াছিলেন। আজ তিনি কন্যাকে কি করিয়া বলিবেন, এতদিনের শিক্ষা ভুলিয়া যাও! কথা দেওয়া জিনিষটা কিছুই নয়! যখন যেমন সুবিধা দেখিবে, তখন তেমনই ভাবে চলিবে! সংসার স্থানটাই এইরূপ! এখানে সত্যের কোন মূল্য নাই—মুখের কথা,—সে শুধু মুখের কথা মাত্র!

যথাসময়ে মণীন্দ্রর পাশের খবর বাহির হইল। বিপিন বাবুও সংবাদ-পত্রে সে খবর পাইলেন। মণীন্দ্র নিজে তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কিছুই লিখে নাই! খুব ধূমধাম করিয়া কালীঘাটে পূজা দেওয়া হইল। আনন্দে, উৎকণ্ঠায় মৃণ্ময়ীর দিনগুলা কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু

বিপিন বাবুর চিন্তারেখাঙ্কিত ললাটে অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় তিন মাস পরে বহু পত্র লিখিয়া বিপিন বাবু মণীন্দ্রের এক অতি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলেন। তাহার মর্ম্ম, মণীন্দ্র কর্ম্ম পাইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছে। বিপিনবাবুকে বলিবার কথা অনেক আছে। একটু সুবিধা পাইলেই—সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। চিঠিখানা ডেস্কের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া বিপিনবাবু দেওয়ানজীকে মুঙ্গের যাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

মুঙ্গের যাইবার পূর্ব্বদিন, রাত্রে আহার করিতে করিতে বিপিনবাবু সহসা মুখ তুলিয়া কন্যার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মিনু, আমরা কেন মুঙ্গের যাচ্ছি, জান কি ?"

একটা সম্ভাবনার মধুর চিত্র মৃণ্ময়ীর চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে সরমের ললিত রাগে রাঙ্গাইয়া তুলিল। হাতের পাখাখানা একটু জোরে চালাইয়া নত নেত্রে সে উত্তর দিল, "তুমি ত কিছু বল নি, বাবা !"

"তুমিও ত কিছু জিজ্ঞাসা কর নি, মা ?"

সত্য! মৃণ্ময়ী লজ্জায় মাটি হইয়া গিয়া মনে ভাবিল, "বাবা কি করে আমার মনের কথা জান্‌তে পারেন!" মৃণ্ময়ীকে অযথা অত্যধিক লজ্জিত হইতে দেখিয়া বিপিনবাবুর মনে হইল, সে হয়ত মণীন্দ্র-সম্বন্ধে মনে মনে সন্দিহান হইয়াছে! কারণ তিনি জানেন, মণীন্দ্রর চিঠি আসিলে সে লুকাইয়া যে কোন সময় তাহা পাঠ করিয়া থাকে! ইদানীং মণীন্দ্রর সংক্ষিপ্ত দুর্ল্লভ পত্র দেখিয়া-দেখিয়া হয়ত তাহারও চিন্তাহীন বালিকা-হৃদয়ে কোন অজ্ঞাত চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে!

৬

মুঙ্গের পৌছিয়া বিপিন বাবু ডাকবাঙ্গলাতেই উঠিবেন, স্থির করিলেন, কারণ এখানে তাঁহার পরিচিত আত্মীয় কেহ ছিল না। একেবারে মণীন্দ্রর বাসায় উঠিতে তাঁহার সাহস হইল না। বিলম্বে মনে মনে অধীর হইয়া উঠিলেও মৃণ্ময়ী প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন সকালে চা-পানের পর বিপিন বাবু ভ্রমণের বেশে বাহির হইয়া গেলে, মৃণ্ময়ী তাহার ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে অতি-যত্নে রক্ষিত রৌপ্যফ্রেমে মণ্ডিত মণীন্দ্রর ফটোখানা বাহির করিয়া দেখিতে বসিল। এখানি বিলাত হইতে মণীন্দ্র তাহাকে উপহার পাঠাইয়াছিল। স্নিগ্ধ ছবি যেন উপহাস করিয়া বলিতেছিল, "ছি! মিনু, তুমিও আমায় সন্দেহ কর!" মৃণ্ময়ী অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

পথের ধারে উদ্যানবেষ্টিত ছোট-খাট বাঙ্গলাখানি গৃহস্বামীর সুরুচির সাক্ষ্য দান করিতেছিল। ডাক্তার সাহেবের বাঙ্গলা। বাগান হইতে বাঙ্গলায় যাইতে দুই ধারে লাল সুরকি দেওয়া দুইটি সরু পথ সর্প-গতিতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার নিকট আসিয়া বিপিনচন্দ্রের উৎসাহ সহসা অবসাদে পরিণত হইল। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার গতিশক্তি নিশ্চল হইয়া পড়িল। সহসা "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও" শব্দে চকিত হইয়া তিনি পার্শ্বে হঠিলেন। ঠিক পশ্চাতেই দুই তিন হাত দূরে একখানা ফিটন-গাড়ী, —কোচম্যান রাশ টানিয়া প্রাণপণে ঘোড়াকে সংযত রাখিয়াছে। চিন্তাতুর বিপিনচন্দ্র গাড়ীর শব্দ শুনিতে পান নাই। বাগানের রাস্তা দিয়া গিয়া গাড়ী গাড়ীবারাণ্ডায় থামিলে অতি-মাত্র বিস্ময়ে বিপিনচন্দ্র

দেখিলেন, সাহেববেশী মণীন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা সঙ্গিনীর সাহায্য-কল্পে হস্ত প্রসারণ করিয়া স্নেহপূর্ণ মিষ্টস্বরে বলিল, "তুমি এত ভয় পেয়েছ, কেন, অমি ? লোকটা কিন্তু কি ষ্টুপিডের মত দাঁড়িয়েছিল ! মানুষ এত অন্যমনস্ক হতে পারে !"

"ভারী অন্যায় ! বাড়ীর মধ্যে যে-সে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেই বা পায় কেন ? আমার যে রকম আতঙ্ক হয়েছিল ! হয় ত, ফেণ্ট হতাম, আর একটু হলে ! জানইত, আমার শরীরের অবস্থা !"

আতঙ্কদায়ীকে দুই-একটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার ইচ্ছায় মণীন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া সহসা সর্পদষ্টের মত নিশ্চল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বহুকালের পর এ অপ্রত্যাশিত মিলনে পরস্পরকে চিনিতে কোন বাধা পড়িল না। মণীন্দ্র ত্বরিতে আপনাকে যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। অমিয়া তখনও দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পানে চাহিয়াছিল।

"আপনি ! কৈ আপনার ত আসবার কোন কথা ছিল না !"

অবস্থা বুঝিতে বিপিনচন্দ্রের আর বাকি রহিল না। অত্যধিক বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত আঘাত লাগায় সহজেই তাঁহার বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়া গেল। "হাঁ, আমি ! তোমার আশ্চর্য্য ব্যবহারের অর্থ বুঝতে না পেরেই শেষে এখানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছি !"

মণীন্দ্র অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে কহিল, "চলুন, ভিতরে যাই, আমার অনেক বল্‌বার কথা আছে। আপনার কষ্ট করে আসবার দরকার ছিল না ! আগামী সপ্তাহে আমি নিশ্চয় দেখা কর্ত্তে যেতাম।"

"থাক্, থাক্ ! ও সব শিষ্টাচার শোন্‌বার আমার সময় নাই। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মণীন্দ্র, এইমাত্র যে মহিলার সঙ্গে তুমি এক

গাড়ীতে এলে, তিনি তোমার কিরূপ আত্মীয়? তুমি জান, এ প্রশ্ন করবার আমার সঙ্গত অধিকার আছে!"

আরক্ত মুখ নত করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম মণীন্দ্র উত্তর দিল, "আমার স্ত্রী!"

"আর আমার কোন জিজ্ঞাস্য নাই" বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়া দৃঢ় পদে বিপিনচন্দ্র চলিয়া গেলেন। স্তম্ভিত, বিষণ্ণ মণীন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া বিপিনচন্দ্রের পদতলে পড়িয়া সে বলে, "আমায় ক্ষমা করুন! না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা করুন,—পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

কিন্তু না! ক্ষমা-প্রার্থনা করিবারও মণীন্দ্রর আজ অধিকার নাই! মৃণ্ময়ীর যে ছবি মণীন্দ্রর চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, আজ অসময়ে তাহার উজ্জ্বলতায় মণীন্দ্রর বাষ্পজড়িত চক্ষু ঝলসিত হইয়া উঠিল।

* * * * *

সেই দিনই বিপিন বাবু কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। মৃণ্ময়ী সব কথা শুনিল। রুদ্ধ বেদনায় তাহার অন্তরখানা কে যেন চাপিয়া ধরিতেছিল।

পিতার নিকট হইতে সন্তর্পণে উঠিয়া নির্জ্জনে আসিয়া সে ভাবনার বাঁধ খুলিয়া দিল! নির্ম্মেঘ আকাশে এ কি আকস্মিক বজ্রপাত! মৃণ্ময়ী দেখিল, তাহার সব ফুরাইয়াছে। মণীন্দ্র আর তাহার নহে! ইহ-জীবনে ত নহেই, পরজীবনেও কোন দাবী নাই! সে এখন অন্যের স্বামী! তাঁহার কথা ভাবিবার, বা তাঁহার জন্য কাঁদিবার অধিকারটুকুও

নাই! যাহাকে পাইল না, তাহাকে পাইবার জন্য প্রাংশুলভ্য ফলের আশায় উদ্বাহু বামনের মত হাত তুলা কিসের জন্য! সেই অনিশ্চিতের জন্য জগতে যাহা একমাত্র তাহার আপনার এবং যাহা কোনরূপ দেনা-পাওনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, সেই অমূল্য পিতৃ-স্নেহটুকু যেন এখন সে না হারায়! মণীন্দ্রর অকৃতজ্ঞতায় শোকসন্তপ্ত পিতার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

অসম্বদ্ধ রুক্ষ চুলগুলা জড়াইয়া লইয়া মৃণ্ময়ী উঠিয়া বসিল। পিতার শয়ন-কক্ষে, পাঠাগারে, সর্ব্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা—এ সকল কার্য্য মৃণ্ময়ী প্রতিদিন স্বহস্তে করিয়া থাকে।

মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া এ কয়দিন পিতার আহারের সময়ও সে নিয়মিত উপস্থিত হয় নাই। তিনিও ডাকেন নাই। মাতৃহীনা হইয়া অবধি পিতৃসেবার সমস্ত ভার সে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল; আহারের সময় অনুনয় করিয়া আদেশ করিয়া সযত্নে আহার করাইত। শয়নের সময় পাখার বাতাস করিয়া পা টিপিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইত! কোনদিন মৃতা জননীর গল্প তুলিলে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যখন দুই চক্ষে বন্যা নামিবার উপক্রম করিত, তখনও বালিকা পিতার মনে পাছে বেদনা লাগে, এই আশঙ্কায় প্রাণপণে সে আত্মদমন করিয়া থাকিত! আর এই একটা তুচ্ছ ঘটনায় মৃণ্ময়ী কাতর হইবে, কর্ত্তব্য ভুলিবে? ঘটনা তুচ্ছ ছাড়া আর কি! সংসারে এমন ঘটনা ত নিত্য ঘটিতেছে। মণীন্দ্র আর এমন কি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছে! অথচ ইহার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জার মত সে এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, পিতার সংবাদ পর্য্যন্ত লয় নাই! ধিক তাহাকে! লজ্জিত হইয়া সে ভাবিল, "না,

তোমার অসীম দুঃখ ভুলিয়া আমি নিজের জন্য কাতর—আমি এমন স্বার্থপর! ছি!”

সেদিন বৈকালে স্বহস্তে জলখাবার তৈয়ার করিয়া মৃণ্ময়ী পিতাকে আহার করাইল। বিপিনবাবু অনভ্যস্ততার দোহাই দিয়া, পীড়িত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিলে, মৃদু হাসিয়া মৃণ্ময়ী উত্তর দিল, “না বাবা, তুমি খাও দেখি।”

৭

সময় মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলে না। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বিপিনবাবুর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া অবধি বুকে একটা বেদনা মধ্যে মধ্যে বড়ই যন্ত্রণা দিত। কন্যার ভাবনা তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল। তিনি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক—কিন্তু মৃণ্ময়ী অসম্মত! অবশেষে পিতার বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মৃণ্ময়ী তাঁহাকে লইয়া বাঁকিপুরের উকিল মাতুল রামচরণ দত্তের নিকট আসিল।

মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া মাতুল বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। “কি আশ্চর্য্য! মিনুটা এত বড় হয়ে উঠেছে, রেখেছ কি করে? বিয়ে দেবে না, না কি?”

অপ্রতিভ বিপিনচন্দ্র মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন, “তাই ত! এবার যা হয়, একটা স্থির করে ফেলব।”

কাছারি হইতে ফিরিয়া রামবাবু সহসা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ হে, মিঃ সেনকে মনে আছে কি? সিভিল সার্জ্জন?” মৃণ্ময়ী বঁটিতে আম ছাড়াইতেছিল। তাহার কম্পিত হস্তে সহসা আঘাত লাগিয়া শোণিতপাত হইল। অঞ্চলে হাত ঢাকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিপিনবাবুকে নিরুত্তর দেখিয়া রামবাবু আরম্ভ করিলেন, "হাঁ, সে সব কথা ত শুনেছি, মণি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিল। তা সে জন্য এখন সে যথার্থই অনুতপ্ত। সে আজ বৈকালেই এখানে আস্‌তে চায়। আমি বলে দিয়েছি, তোমাদের তাতে সম্পূর্ণ মত আছে।"

সহসা উত্তেজিত ভাবে বিপিনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "মত আছে! কি সর্ব্বনাশ! সে অকৃতজ্ঞের মুখ দেখলে—"

"আহা—ব্যস্ত হও, কেন? সব কথা শোন আগে। যদিও সে কোন কারণে তোমার অপ্রিয় হয়ে থাকে, তাই বলে তার এই শোকের সময় কি তোমার উচিত নয়, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া?"

উত্তেজনায় বিপিনবাবু আরাম-চেয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শ্যালকের কথায় আবার স্থিরভাবে শয়ন করিলেন। "শোকের সময়!"

"হাঁ, হঠাৎ বেচারার স্ত্রী মারা যাওয়ায় দুটি ছোট ছেলে নিয়ে সে ভারী বিব্রত হয়ে পড়েছে।" শেষের কথা কয়টি বলিবার সময় সূক্ষ্মদর্শী আইন-জীবি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাগিনেয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে মুখে কিন্তু সুগভীর বিষণ্ণতা ছাড়া অপর কোন ভাবই লক্ষ্য হইল না।

* * * *

৩

সন্ধ্যার সময় পিতা ও মাতুলের অনুপস্থিতিতে মিঃ সেনকে অভ্যর্থনা করিবার ভার মৃণ্ময়ীর উপরই পড়িল। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা সেদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন।

মিঃ সেন যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন মৃণ্ময়ী সূচীর কাজ করিতেছিল।

মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া মণীন্দ্র বিস্মিত হইল। ইহাকে তুচ্ছ করিয়া সে সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা আত্মসুখ-পরায়ণা অমিয়াকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল! ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় মৃণ্ময়ীর সুখ-পালিত দেহ অপেক্ষাকৃত কৃশ হইলেও তাহার সুন্দর মুখে, সুকুমার দেহে এমন একটা স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহাতে মানুষের মন আপনা হইতে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে! দুঃখে বর্ণের জ্যোতি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

মৃণ্ময়ী সহজভাবেই মণীন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিল। আজ মৃণ্ময়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার অসীম অপরাধের গুরুত্ব মণীন্দ্র প্রথম অনুভব করিল!

অমিয়ার অকাল-মৃত্যুতে প্রথমে শোকানুভব করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই মণীন্দ্রর মনে হইয়াছিল, মৃণ্ময়ী-লাভ তাহার পক্ষে এখন নিতান্ত অসম্ভব নহে! আপনার মৃত্যু দিয়া যে স্ত্রী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, তাহার প্রতি মনে একটু কৃতজ্ঞতারও উদয় হইল।

মণীন্দ্র জানিত, মৃণ্ময়ীর আজিও বিবাহ হয় নাই—আর শুধু মণীন্দ্রর প্রতি সুগভীর ভালবাসাই যে তাহার একমাত্র কারণ, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই!—এই কথা ভাবিয়া অনেক সময় সে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া আজ এখন তাহার মনে হইল, সে গর্ব্বের কোন মূল্য নাই!

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। বেয়ারা ঘরে আলো দিয়া গেল। সেই সঙ্গে সদ্য-আহৃত রজনীগন্ধা ও বেলফুলের রাশি আনিয়া সে

টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। মৃণ্ময়ী হাতের শেলাইটা ভাঁজ করিয়া রাখিতে রাখিতে খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, "কৈ, বাবা এখনও ফির্লেন না ত!"

"মিস্ বসু, আপনারা নাকি কাশী যাবেন?"

মৃণ্ময়ী উঠিয়া তাহার শেলাইয়ের বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "কাল সকালের পঞ্জাব মেলে যাব। সব গোছান-গাছান হয়ে গেছে। বাবার যে আজ কেন এত দেরী হচ্ছে—"

মণীন্দ্র চকিত নেত্রে একবার মৃণ্ময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এত শীঘ্র চলে যাবেন!" ঈষৎ হাসিয়া মৃণ্ময়ী বলিল, "শীঘ্র আর কই! আমরা ত কাশী যাব বলেই বেরিয়েছিলুম, বাবার বুকের বেদনাটা বাড়্ল, আর মামাও জেদ করতে লাগলেন, তাই এতদিন এখানে রয়ে গেলুম!"

মণীন্দ্রর মুখে উদ্বেগের ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। "অবশ্য বাঁকী-পুর থেকে কাশী এত বেশী দূর নয়, যতটা আমার মনে হচ্ছে—" মণীন্দ্রর মনে কাশীর দূরত্বের কথাটাই উদয় হইয়াছে! মৃণ্ময়ী যে দিন গণিয়া গণিয়া সুদূর সমুদ্র-পারের হিসাব করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরেরও অধিক কাল কাটাইয়া দিয়াছে! কোথায় কত দূরে শত সহস্র যোজন সমুদ্র ব্যবধানের অন্তরালে! এ কথার যে সহজ উত্তর ছিল, মৃণ্ময়ী তাহা বলিল না। প্রসঙ্গ ফিরাইবার ইচ্ছায় বিষয়ান্তরের অবতারণা করিয়া সে বলিল, "কৈ, আপনার ছেলেদের একদিন আনলেন না! তাদের সঙ্গে তাহলে আর দেখা হল না!"

"তারা এখন কল্কাতায় পিশিমার কাছে আছে! তাদের ত

দেখবার-শোন্‌বার কেউ নেই আর—আপনি যদি তাদের দেখতে চান, সে ত তাদের সৌভাগ্য।”

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বিরক্তিকর প্রসঙ্গটাই আসিয়া পড়ে! মৃণ্ময়ী উৎকণ্ঠিত ভাবে বারবার বাহিরের দিকে চাহিতেছিল। পিতা ফিরিয়া আসিলে হয়!

বাহিরে কুয়াশার তরল আবরণ ভেদ করিয়া চাঁদের নির্ম্মল আলো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বারান্দার সদ্য-ফোটা ফুলগাছগুলার মাথায় সাদা সাদা ফুলের রাশি সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ সমভাবে বহিয়া আনিতেছিল। মৃণ্ময়ী মণীন্দ্রর কথার কোন উত্তর দিল না। চাবির গোছাটা লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতেছিল। মণীন্দ্র উৎকণ্ঠিত আকুল নেত্রে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভাব বুঝা গেল না। সময় চলিয়া যাইতেছিল। কথাগুলা বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়া কণ্ঠের কাছে আসিয়া ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দিতেছে। তবু সঙ্কোচের বাধা কাটে না! অথচ না বলিলেও নয়! এ সুযোগ হারাইলে হয় ত আর কখনও, হয়ত বা সমস্ত জীবনেও আর উপায় মিলিবে না! বিশেষতঃ রামচরণ বাবুর কথাগুলা যদি সত্য হয়? তাহা হইলে? তিনি বলিয়াছেন, “মিনু এখনও তাহাকে ভালবাসে! আর সেই জন্যই সে বিয়ে করেনি।” সত্যই কি মণীন্দ্র এত ভাগ্যবান্! কন্যার অমতে বিপিন বাবুও তাহার বিবাহ দিবেন না।

“মিস্ বসু, আমি বেশী কথায় ভূমিকা কর্ত্তে চাই না! সে মনের অবস্থাও আমার নেই। আপনার মামার মুখে শুন্‌লেম, আপনি নাকি চিরকুমারী থাকবেন! আর আপনার অমতে ওঁরা আপনার বিয়ে দেবেন না। কথাটা কি সত্য?”

সহসা এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মুহূর্ত্তের জন্য মৃণ্ময়ীর ললাট হইতে কর্ণ-মূল অবধি রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার কালো চোখে অপমানের একটা তীব্র উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল। "কিন্তু এ সব প্রশ্ন করবার আপনার কোন অধিকার নেই, বোধ হয়, মিঃ সেন!"

মণীন্দ্র হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কিন্তু আমি যদি অধিকারের আশা রেখে থাকি?" সোৎসুক নেত্রে মণীন্দ্র মৃণ্ময়ীর মুখের পানে চাহিল, "যে অধিকার নিতান্ত নির্ব্বোধের মত, পাগলের মত নিজের দোষে আমি হারিয়েছিলেম, আজ যদি নতজানু হয়ে ভিক্ষুকের মত, তা প্রার্থনা করি, তবুও কি সে আশা দুরাশা হবে? আমি জানি, আমি তোমার অযোগ্য, সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবু আমায় বিশ্বাস কর, মিনু আমি তোমায় ভালবাসি!"

মুহূর্ত্তের জন্য মৃণ্ময়ীর সুন্দর মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র! বালিকা অসীম ক্ষমতায় শীঘ্রই আপনার বিচলিত ভাব সম্বরণ করিয়া লইল।

মৃণ্ময়ী নত মুখে সেলাইয়ের সূতাটা মাটি হইতে কুড়াইয়া লইয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "ক্ষমা করবেন, মিঃ সেন, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় ত চিরকাল থাকতে পারে, অন্য কোন সম্পর্ক নয়! কে জানে, এই আমাদের শেষ দেখা কি না! আজ বিদায়ের দিনে কায়মনে প্রার্থনা করি, আপনার মাতৃহীন ছেলেরা যেন ভাল থাকে, সুখে থাকে!"

মণীন্দ্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কম্পিত বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনি স্তব্ধ গৃহে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল! কুয়াশা-মুক্ত চাঁদ তরল জ্যোৎস্নার

আবরণ ভেদ করিয়া সকৌতুক নেত্রে যেন ঘরের ভিতরের এই করুণ বিদায়-দৃশ্য দেখিতেছিল। বারান্দায় টবে জুঁই ফুলের গাছ হইতে প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ চুরি করিয়া স্নিগ্ধ বাতাস মৃণ্ময়ীর ললাটে, অলকগুচ্ছে দোলা দিয়া ফিরিতেছিল। ক্রমে ঘড়িতে নয়টা বাজিল। সে শব্দে সচেতন হইয়াই যেন মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপর হইতে টুপীটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তাই হোক্, মিনু,—তোমার দেওয়া দণ্ড যতই কঠোর হোক, আমার তা শিরোধার্য্য! ইহ-জগতে হয়ত এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু পর জগতে যদি ভুলের মার্জ্জনা থাকে, তাহলে সেখানে আবার আমাদের দেখা হবে।"

মৃণ্ময়ীর মুখের প্রতি না চাহিয়াই মিঃ সেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মৃণ্ময়ীর ইচ্ছা হইল, একবার ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করে! একবার বলে সে-ও বড় অভাগিনী! কিন্তু সে উঠিল না! বাধিয়া গেল!

বাহিরে জুতার শব্দ মিলাইয়া গেলে, সে উঠিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিল। তারপর সহসা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বালিকার মত সে কাঁদিতে লাগিল।

আজ দশ বৎসর পরে শেষ বিদায়ের দিনে মণীন্দ্রকে সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠে তেমনই করিয়া তাহার নাম ধরিয়া সে ডাকিতে শুনিয়াছে। এই আলোকহীন অন্ধকার কক্ষের অধিকতর অন্ধকার তাহার হৃদয়ের মধ্যে মণীন্দ্রর যে উজ্জ্বল ছবি সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ সেনের অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত চিত্রের সহিত তাহা মিশিয়া এক হইয়া সমস্ত

গোলমাল করিয়া দিয়াছে! মণীন্দ্রর ছবি খুঁজিতে গেলে মিঃ সেনের মুখই যে জাগিয়া উঠে! মণীন্দ্র বলিয়া গিয়াছে, পরলোকে আবার সাক্ষাৎ হইবে!

মৃণ্ময়ী আপনার হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিল, কৈ সে ত মণীন্দ্রর প্রতি কোন কামনা রাখে না! ইহলোকে ত নহেই, পরলোকেও নহে! তবে চোখের জল বাঁধ মানে না, কেন? এ কি সমবেদনা? কে জানে?

রাজকন্যা

বড়দিন-উপলক্ষে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে নূতন নাটক "ভীলরাজ" অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল। নায়ক রাজার ভূমিকা যোগ্য অভিনেতার হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। অভিনেতাটি দর্শকগণের অত্যন্ত প্রিয়। রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রবেশমাত্রই দর্শকগণের মধ্যে একটা আনন্দের চাঞ্চল্য খেলিয়া যাইত। শেষ অঙ্কে ভাঙ্গা হিন্দী ও বাঙ্গলা-মিশানো ভাষায় রাজা যখন দেশের গান গাহিতে আরম্ভ করে, তখন এন্‌কোরের ঝড় বহিয়া যায়! সেই রংমাখা, কপালে উল্‌কী-পরা, সজারুর কাঁটা ও পাখীর পালকের মুকুট মাথায়, পুঁথি ও কাঁচের মালা গলায় দেওয়া বিচিত্র বেশধারী, রাজা সহজেই দর্শকগণের হাস্য-উদ্রেকে সক্ষম হয়। জরি লাগান সালুর কাপড়-পরা রাজার কটিতটে যে মার্জ্জিত ঝক্‌ঝকে ছোরা ঝুলান থাকিত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভীত মুগ্ধ নেত্রে তাহারই পানে চাহিয়া থাকে। তাহার লম্ফ-ঝম্প, বিকট চীৎকার, ক্ষিপ্রকারিতা, বীরত্ব ও যুদ্ধের কৌশল-প্রদর্শন সকলই দর্শকগণের মতে অননুকরণীয়! অর্থাৎ সকলেই বলিত, রঙ্গপীঠে এমন "ভীলরাজা" পূর্ব্বে আর কেহ কখনও দেখে নাই!

সে রাত্রে রাজার অভিনয় অন্যান্য রাত্রির চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন তাহার আকৃতি এমন ভীষণ দেখাইতে-ছিল যে, বালক-বালিকার দল ভয় পাইয়া আত্মীয়গণের কাছে

আর একটু ঘেঁসিয়া বসিল, অথচ লুকাইয়া মুখ ফিরাইয়া না দেখিলেও নহে! দর্শকগণও তুমুল আনন্দধ্বনির সহিত অজস্র করতালি বর্ষণ করিতেছিল।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইলে রাজা আপনার পুরাতন র‍্যাপারখানিতে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া সাজঘরের পশ্চাতের ছোট দ্বারটি খুলিয়া একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। আকাশে নক্ষত্রের ঝিক্‌মিকে আলো। চাঁদের চিহ্নমাত্র নাই। কিছু পূর্ব্বে ঈষৎ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতের সহিত ঠাণ্ডা ভিজা বাতাস ছুরির মত র‍্যাপার অতিক্রম করিয়া রাজার গায় বিঁধিতেছিল। রাজা র‍্যাপারখানা আর-একটু টানিয়া গায় ঢাকা দিল! অদূরে বোসেদের বাগান হইতে অজস্র হাস্না-হানার গন্ধ ও ঝিঁঝিঁর রব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। রাজার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। বাগান পার হইয়া একখানি ছোট দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীখানি মান্ধাতা বা তাঁহারই সমসাময়িক আমলের কি না, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না! চুণবালি খসিয়া ঝরিয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এবং ভিতরের কঙ্কাল ইটকাঠগুলা সবই বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা একটু ইতস্তত করিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দ্বার খোলাই ছিল। ভীলরাজা বাঁকা চোরা সিঁড়ি বহিয়া দালানের সম্মুখে বড় ঘরখানির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতরকার অবস্থা বাহিরের মত শোচনীয় নহে। ঘরখানি বড়।

দেওয়ালে চুণকাম করা, কোথাও দাগটি অবধি নাই! গৃহ-সজ্জা সামান্যই। এক প্রান্তে একখানি খাট, খাটে মশারি ফেলা। ছোট একটি, চতুষ্কোণ টেবিলের উপর রাশীকৃত শিশি, বোতল, কাগজের কৌটা, মোড়ক, থার্‌মমিটার, ফাইল-করা প্রেসক্রিপ্‌সনের স্তূপ অর্থাৎ রোগীর উপযোগী সকল দ্রব্যই সজ্জিত। হরিণের শিং লাগান ছোট ব্রাকেটে একটি ঘড়ি। পার্শ্বে দুইখানি অর্দ্ধ-জীর্ণ বেতের চেয়ার এবং একটি কাঠের আল্‌নায় খানকয়েক কাপড়-চোপড়। ইহাই ছিল, গৃহের আস্‌বাব-পত্র। টেবিলের উপর একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্যে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। তাহার মুখ ভাবহীন। রাজা ঘরে ঢুকিলে রমণী তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল! তাহার অবিচলিত মুখে এতটুকু ভাবান্তর ঘটিল না। রাজা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে, এখন?"

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দর্শকগণের মধ্যে যদি কেহ সে স্বর শুনিতে পাইত, তবে তাহা যে রাজার স্বর নয়, এ সম্বন্ধে বাজি রাখিয়া হারিতেও বোধ হয় প্রস্তুত থাকিত!

রমণী মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "চুপ্! একটু ঘুমিয়েছে!" ঈষৎ কম্পিত স্বরে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ কি বেড়েছে, তাহলে?"

"না—একই ভাব। বাড়া-কমা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

"অনেক ক্ষণ জেগেছিল, বুঝি? খুঁজেছিল, আমায়?"

রমণী বলিল, "বলছিল, আজ তুমি একটু সকাল সকাল আসবে—অনেকবার ঘড়ীর পানেও চেয়ে দেখছিল—আজ যেন একটু বেশী ছট্‌ফট্ করছিল! এখন এক ঘণ্টার উপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাচ্ছে।"

শয্যাপার্শ্বে গিয়া রাজা ধীরে ধীরে মশারি সরাইয়া দেখিল।

শয্যায় একটি সাত বৎসরের ছোট মেয়ে ঘুমাইতেছিল। রাজার মেয়ে! তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি—জীবন-সর্ব্বস্ব—একমাত্র সন্তান। জগতে এই একটি প্রাণী—ইহার জন্যই সে বাঁচিয়া আছে—ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার সংসার, কার্য্য এবং চিন্তা। বালিকার মুখখানি কি সুন্দর! কি কোমল, মাধুর্য্যমণ্ডিত! মুদিত চক্ষের কালো পক্ষ্মগুলিতে মুখখানি যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। বসন-ভূষণে সজ্জিতা সত্যকার রাজ-কন্যা নহে,—একখানি দেশী নীলাম্বরী ছোট কাপড়-পরা—শুভ্র, সুন্দর ক্ষীণ হাত দুটিতে দুইগাছি রূপার চুড় অবধি নাই! বিছানার চাদর-খানি সেলাই করা—গায়ের লেপখানি তালি-লাগান—তথাপি রাজ-কন্যা! যথার্থই সে মূর্ত্তি রাজকন্যার উপযুক্ত! নিপুণ ভাস্কর-গঠিত প্রতিমার মতই নিটোল, শুভ্র—বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের চরম আদর্শ, সে সৌন্দর্য্য! আঙ্গুর-গুচ্ছের মত থোলো-থোলো কেশগুলি বালিশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঈষৎ-বিভিন্ন রক্ত অধরের মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস বহিতেছিল। স্থিরভাবে অচপল নেত্রে রাজা বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ঘুমন্ত পবিত্র মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। রাজার তখনকার সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলে যে মেয়ে ভয় পাইবে, এমন আশঙ্কাও ছিল না। কারণ এ মূর্ত্তি বালিকা আরও কতদিন দেখিয়াছে, কখনও ভয় পায় নাই।

২

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন গোধূলির গোলাপী আলোক দিগন্ত রেখায় মিলাইয়া গিয়া রজনীর অচির-আগমনের আভাষ দিতেছিল,

দিবা ও রাত্রির সেই সন্ধি-স্থলে তাহার জীবন-সঙ্গিনী বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিমুখে কোন্ সুদূর লোকে চলিয়া গেল! সেদিন হইতে খসিয়া-পড়া নক্ষত্রের মত মাতৃ-অঙ্কচ্যুত এই ছোট মেয়েটি তাহারই কোলে আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে! স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে ভগবানকে নিষ্ঠুর বলিয়া রাজা কোন অনুযোগ করিল না, অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিল না! অশ্রু মুছিয়া দ্বিগুণ স্নেহে শিশুটিকে আপনার বুকের ভিতর শুধু চাপিয়া ধরিল। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত চারিমাসের শিশুর পালন-অনভিজ্ঞ তাহাকে প্রথমে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইলেও দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণে গৃহস্থালির সুবিধা বা ভবিষ্যতে তাহার সেবা-লাভ ও কন্যার পালন-ভার-সমর্পণের সকল সুবিধাই সে নির্ব্বোধের মত স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিল। একজন দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য ও শিশুর জন্য যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন, তাহা সহজেই সম্পন্ন হইত। স্ত্রীর চিকিৎসায় শেষ কপর্দ্দকটি অবধি নিঃশেষে ব্যয় করিয়া সে তখন সম্পূর্ণ রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে! অপর কোন আত্মীয় না থাকায় স্ত্রীর অসুখের সময় পোষ্ট অফিসের পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকুরিটি পর্য্যন্ত হস্তচ্যুত হইয়াছে। এখন নিজের জন্য না হউক, মেয়েটির জীবনত রক্ষা করিতে হইবে! উপায়ান্তর না দেখিয়া থিয়েটারে একটা কর্ম্মখালির সংবাদ পাইয়া সে চাকুরির আবেদন করিল। তাহার গলা মিষ্ট—সখ করিয়া সামান্য গান-বাজনাও সে শিখিয়াছিল! ম্যানেজার দয়ালু ব্যক্তি, কাজেই তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তখনই তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

শুধু দয়া-ধর্ম্মের অনুরোধে থিয়েটারের ম্যানেজার তাহাকে চাকুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নাই যে, এই

মনীগৌবি লোকটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার থিয়েটার হইতে একজন আদর্শ অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে! রাজা নিজেও তাহার এই অপ্রত্যাশিত সফলতায় একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। এ যেন আর কেহ! যতক্ষণ সে থিয়েটারে থাকে, যেন সে অন্য লোক! এখানে তাহার গৃহ নাই, বন্ধন নাই, কন্যা নাই, চিন্তা নাই, কিছু নাই! রাজার ভূমিকায় তাহাকে মানাইত, ভাল। উন্নত দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ! সেই জন্যই বাছিয়া বাছিয়া রাজার ভূমিকা তাহাকে দেওয়া হইত। সেও আপনাকে "রাজা", "নবাব" "বাদশাহ" বা "সর্দ্দারের" জীবনের মধ্যে তন্ময় হইয়া পড়িত, তাই তাহার অভিনয় এত স্বাভাবিক, এমন প্রাণস্পর্শী!

জীবনে দুই মহা আকর্ষণ দুই দিক হইতে তাহাকে টানিতেছিল। প্রধান এবং প্রবল আকর্ষণ, তাহার কন্যা! দ্বিতীয় ও ক্ষণিক, এই থিয়েটার। থিয়েটার ভাঙ্গিলে সে যেন আর একজন নূতন লোক হইয়া পড়িত! তখন আর তাহার সে উৎসাহ, সে আনন্দ কিছুই থাকিত না। সঙ্গীরা তাহার নাম দিয়াছিল, "মুখস-পরা ভদ্রলোক।" কেহ কেহ তামাসা করিয়া বলিত, "তা বুঝি জান না, উনি হচ্ছেন, রাণা প্রতাপসিংহ, —মহারাজ যোধপুর, মোগল সম্রাট শাহান সা আলমগীর ইত্যাদি—উনি কি আর আমাদের মত হেঁজী-পেঁজী মানুষের সঙ্গে কথা কন?"

রাজা কোন কথা, কোন বিদ্রূপই গায় মাখিত না, কোন আমোদে যোগ দিত না। থিয়েটারের সংস্পর্শ পাঁচ বৎসরেও তাহার অন্তরে বাহিরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহের বাহিরে লাগিয়া গোলাগুলি যেমন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, সঙ্গীদের পরিহাস,

বিদ্রূপ, অভিনেত্রীগণের হাব-ভাব হাসি-চাহনিও তেমনই তাহার মনের বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিত। ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়া সকলেই ইদানীং তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিশেষতঃ সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, তাহার সেই মেয়েটির জন্য! সরল, সুন্দর, দেবপূজার সুরভি-চন্দনলিপ্ত কুসুমের মতই স্নিগ্ধ অম্লান ফুলটি! মেয়েটিকে যে একবার দেখিত, সে আর সহজে চোখ ফিরাইতে পারিত না! মুগ্ধ নেত্রে বার বার চাহিয়া দেখিত! আর মনে মনে ভাবিত, "কি সুন্দর!" মেয়েটিকে সকলেই ভালবাসিত। অনেকে প্রকাশ্যভাবেই বলিত, এমন রত্ন যার ঘরে যাইবে, সে দরিদ্র হইলেও লক্ষপতি! এমন সন্তানের যে পিতা, সে অভিনেতা হইলেও ভাগ্যবান!

লোকে যে ভাবেই বলুক, কথাটা রাজার বুকে আঘাত করিত। সত্যই সে ভাগ্যবান্—এমন কন্যার পিতা সে, তবু—তবু সে একজন থিয়েটারের "য়্যাক্টর" মাত্র! হয়ত পিতার এই অপরাধে তাহার "রাজকন্যা" কোন "রাজপুত্রের" গলায় মালা দিবার শুভ সুযোগ হারাইয়া ফেলিবে! কতদিন সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, থিয়েটারের চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র চেষ্টা দেখিবে—কিছু না হয়, ফেরি করিয়া কাপড় বেচিবে! কিন্তু না—তাহা অসম্ভব! রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালিবার পূর্ব্বে, "চাই বেলফুল" "গড়ে মালা"ও "কুলপী বরফ"-ওয়ালার আবির্ভাব না হইতেই—থিয়েটার গৃহের দ্বারদেশে সে আপনার ভূমিকা বুঝিয়া লইবার জন্য নিয়মিত প্রস্তুত থাকিত। মাতাল যেমন সহস্র বার মদ খাইবে না, শপথ করিয়াও মদের দোকানের চৌকাট ছাড়িতে পারে না, সেও তেমনই এই থিয়েটারের নেশায় বিভোর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

মেয়েটির নাম ছিল, "লিলি" পড়িয়াছিল। সে নামে অবশ্য অপরে তাহাকে ডাকিত না। তাহারা ডাকিত, "রাজকন্যা!" মেয়েটির সে নামে কোন আপত্তি ছিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহার বাপের মত "রাজা" থিয়েটারে আর কেহ নাই, হইবেও না। সেইজন্য যখন থিয়েটারের লোকেরা তাহাকে "রাজার মেয়ে" বলিয়া নির্দ্দেশ করিত— সে তাহার বিশাল কালো চোখের প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রাজকন্যার মতই অচল গাম্ভীর্য্যে বসিয়া থাকিত। মেয়েটির সৌন্দর্য্যে ও মিষ্ট স্বভাবে ম্যানেজার হইতে সামান্য ভৃত্যটি পর্য্যন্ত তাহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিত। পিতার সহিত প্রত্যহ সে নিয়মিত থিয়েটারে আসিত। কোন দিন তাহার অনুপস্থিতি ঘটিলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে রাজার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম করিত। বাড়ীতে অন্য কেহ না থাকায় মেয়েকে সঙ্গে আনাই রাজার পক্ষে সুবিধার ছিল। শেষ রাত্রে ঘুমন্ত মেয়েকে র‍্যাপারে ঢাকিয়া বুকে তুলিয়া বাড়ী ফিরিতে সে ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করিত না।

৩

ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক শীতের রাত্রে মেয়েকে লইয়া রাজা থিয়েটারে আসিয়াছিল। সেদিন সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া সন্ধ্যার সময় অল্প অল্প বৃষ্টির সহিত জোর বাতাস বহিতেছিল। শীতে হাড় অবধি ঝনঝন করিতেছিল। ঘরের ছাদ ফুটা হইয়া জল পড়িয়াছে—এত বৃষ্টি! রাজার ইচ্ছা ছিল, সে রাত্রে মেয়েকে থিয়েটারেই রাখিয়া আসে। কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। ঠিকা ঝি ক্ষেমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে এবং বাড়ীর অপর অংশের ভাড়াটিয়া

মমতাময়ী বিনোর মা ভগিনী-পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। অগত্যা বাধ্য হইয়াই তাহাকে লিলিকে থিয়েটারে লইয়া আসিতে হইয়াছিল! সেইখানেই কম্প দিয়া মেয়েটির জ্বর হইল। জ্বরের সঙ্গে কাশি।

সামান্য সর্দ্দির জ্বর ভাবিয়া প্রথমে যেন যত্ন লওয়া হইল না। দুই দিনেই জ্বর ছাড়িয়া গেল—কিন্তু কাশি যায় না। পাড়ার মধ্যে শিশু-চিকিৎসায় ও নাড়ীজ্ঞানে বিনোর মার যথেষ্ট সুনাম ছিল। রাজা তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। জলপড়া 'কবচ,' মাদুলি—নানাবিধ অনুষ্ঠান করা হইল, শেষে ডাক্তার আসিল। ডাক্তার বলিল, "অল্প জ্বর ভিতরে ভিতরে প্রত্যহই হয়।" বর্ষার প্রারম্ভে জ্বর বাড়িল। রাজা সাহেব ডাক্তার আনাইল। ডাক্তার বলিলেন, "কেশ্ সিরিয়স—মেয়েটির জীবনের আশা অল্পই।"

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে মানুষ তাহার ভীষণতা উপলব্ধিই করিতে পারে না। কিন্তু বজ্রাঘাত সহ্য করিবার জন্য যাহাকে প্রস্তুত হইতে বলা যায়,—জীবন-ধারণ তাহার পক্ষে শত বজ্রাঘাতে মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। রাজা পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল স্পন্দহীন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার রাজার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন; সেইদিন হইতে রোগীর সম্বন্ধে সাবধানে মতামত প্রকাশ করিতেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল। রাজকন্যার রোগের এতটুকু উপশম দেখা গেল না। স্বর্ণলতা শয্যায় মিলাইয়া আসিতেছিল। রাজার থিয়েটারের নেশা ফুরাইয়া গিয়াছিল কি না, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু ডাক্তার ও ঔষধের জন্য যে প্রচুর অর্থের

প্রয়োজন, তাহার জন্যও ত চাকুরী ছাড়া যায় না! অনিশ্চিত কার্য্যের আশায় নিশ্চিতকে ত্যাগ করিবার সময়ও নাই। থিয়েটারের হাসি আমোদ বেত্রাঘাতের মত হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে, তথাপি কোন উপায় নাই। মেয়েটিকে বাঁচাইতেই হইবে! কলের পুতুল যেমন দম পাইলে হাসে, হাততালি দেয়, খেলা দেখায়, দম বন্ধ করিলেই সব স্থির—রাজার অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াইল। তাহারে প্রকৃতিতে সাধারণের সহিত স্বাতন্ত্র্য থাকায় লোকে সহজে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিত না। তথাপি প্রত্যহ সকলেই আগ্রহের সহিত রাজকন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিত; এবং অকপটে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, মেয়েটি যেন আরাম হয়! আবার যেন সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে মূর্ত্তিমতী কলালক্ষ্মীর মতই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি লইয়া ফুলের তোড়া হাতে পূর্ব্বের মত আসিয়া বসে! নিয়মিত দর্শকের দল বহুদিন বালিকার নির্দ্দিষ্ট আসনখানির প্রতি বৃথা চাহিয়া দেখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ অতৃপ্ত চোখে মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া রাজা ধীরে ধীরে মশারিটি আবার ফেলিয়া দিল। তারপর প্রতিবেশিনী বিনোর মার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি এসেছিলেন?"

রমণী বলিল, "তুমি যেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছ—অমনই ডাক্তার এল।"

"ডাক্তার কি বল্লেন?" একটা ব্যাকুল উৎকণ্ঠা রাজার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইতেছিল। ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার স্বরে রমণী বলিল, "ডাক্তার কি বল্লে?" "যা তারা চিরকাল বলে থাকে, 'কিছুই নয়, ভয় নেই, সেরে যাবে।' তারা ত আর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যায় না,

একটুখানি যদি ভাল দেখে ত, বলে, এ যাত্রা রোগী রক্ষা পেয়ে গেল ! একটু যদি খারাপ দেখে ত বলে, তাই ত, রোগীর রক্ষা পাওয়া শক্ত, ওদের চাল বুঝতে আমার আর কিছু বাকী নেই—আমিও ত তিন তিনটেকে যমের মুখে তুলে দিছি, গায়ের গহনা বেচে শাঁখারীটোলার অত বড় বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে, সে বাঁধা আর খালাস করতে পারলুম না—সুদে সুদে জলের দামে বিকিয়ে গেল। কসুর ত কিছু করিনি ! সমস্তই বেরথা হল—কেবল ভস্মে ঘি ঢালা—পূর্ব্বজন্মে 'ধেরো' ছিলেম, ঋণ শোধ করিয়ে দিয়ে গেল ! শত্রু কি আর-কোথাও থেকে আসে ? পেটেই মানুষের শত্রু জন্মায়।"

রাজা ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার ওষুধের কথা কিছু বল্লেন ?"

"বল্লে, ঐ ওষুধই চালাও। ওদের ঐ বাঁধা গৎ আছেই ত!"

টেবিলের উপর হইতে ঔষধের শিশি লইয়া রাজা দেখিল, তাহাতে একদাগ মাত্র ঔষধ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা বলিল, "আমি থিয়েটার থেকে ফেরবার সময় আর এক শিশি ঔযধ নিয়ে আস্‌ব ! কিন্তু আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, তুমি এর কাছে কি থাকতে পার্‌বে, দিদি ?"

রাজার স্বর অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত বেদনা-পূর্ণ।

রমণী বলিল, "তা আমি কেমন করে বল্‌ব, বল ? কর্ত্তার আজ বাড়ী আসবার কথা আছে। তিনি যখন বাড়ী ফেরেন, সহজ অবস্থাতে ত আর ফেরেন না। মাতলামো করে চেঁচিয়ে পাছে মেয়েটার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, সে সব ত আমায় সামলাতে হবে !" রমণীর কথায় রাজার

মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, বাহির হইতে তাহা কিছুই বুঝা গেল না। রাজা পুরাতন র‍্যাপারখানিতে আপনার রঙ-মাখা বিচিত্র বেশ যথাসাধ্য গোপন করিয়া অত্যন্ত ধীরে দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! তাহার চলনের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কি একটা অত্যন্ত গুরু ভার বহন করিয়া চলিয়াছে!

৫

থিয়েটার-বাটী যদিও খুব নিকটে, তথাপি আজ তথায় পৌঁছিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ম্যানেজার বিরক্ত হইয়া লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। বিকট হুঙ্কারের সহিত রঙ্গমঞ্চে ভীলরাজের আবির্ভাব হইল। দর্শকগণের করতালি ও হাস্যধ্বনিতে রঙ্গভূমি মুখর হইয়া উঠিল। বড়দিনের দুই দিন মাত্র বাকি। কলিকাতা ও মফঃস্বলের লোকে সেদিন থিয়েটার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিল-ধারণেরও স্থান ছিল না। থিয়েটার ভাঙ্গিতেও কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহার উপর আবার দর্শকদের প্রশংসা লইবার জন্য রাজাকে তিনবার যবনিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

তাড়াতাড়ি হাতের ও মুখের রঙটা ধুইয়া জামা-কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া রাজা পথে বাহির হইয়া পড়িল। পরিবর্ত্তনটা যে শুধু বাহিরেই বুঝা গেল, তাহা নহে, সেটা অন্তরের দীনতাকেও স্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিল। সেই লম্ফঝম্ফকারী হরিণের মত চঞ্চল লঘু গতি, অসীম উৎসাহ বীরত্ব ও আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ সেই ভীলরাজা, এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরের

একটি সাধারণ ভদ্রলোক—একজন স্নেহ-কাতর পিতায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে! পাণ্ডু মুখে দুঃখের একটা গভীর ছায়া, রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টি উৎকণ্ঠা-মলিন, ললাটে চিন্তার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত!

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সহিত জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। উষার আলোকে চারিদিকে জীবনের চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বাবুর দল থিয়েটার দেখিয়া শুষ্ক মুখে, কোটরগত চক্ষে, মাথায় চাদর জড়াইয়া, হাতে ছড়ি ঘুরাইয়া শিষ্ দিতে দিতে বাড়ীর পথে ফিরিতেছিল। পুণ্যার্থিনী রমণীগণ অত শীতেও গঙ্গাস্নানের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। অঞ্চলে ভিখারীদের জন্য চাউল বাঁধিয়া বাম হস্তে গামছা জড়ান কাপড়খানি এবং দক্ষিণ হস্তে তুলসী ও অশ্বত্থ তলায় জল দিবার জন্য ছোট পিতলের ঘটি লইয়া দুই একজন করিয়া দল বাঁধিয়া গঙ্গার পথে চলিয়াছেন। রাজাও দ্রুত পদে বাড়ী ফিরিয়া পূর্ব্বের মতই সাবধানে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিতে ভয় হইতেছিল, কি জানি, যদি তাহার জ্বর বাড়িয়া থাকে!

বিনোর মা চলিয়া গিয়াছিল। হ্যরিকেনের আলোটাও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া মেয়েটি মশারির মধ্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আছে। রাজা ধীরে ধীরে মশারি তুলিতেই লিলি তাহার দুইখানি শীর্ণ কোমল বাহু দিয়া পিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল, "এসেছ, বাবা?"

"হাঁ মা।" কিন্তু এ কি? লিলির দেহ ঘর্ম্মে ভিজিয়া গিয়াছে যে! তাহার জ্বর নাই! কি শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ সে স্পর্শ! অত্যধিক

আনন্দের আবেগে রাজার মুখে বাক্য-নিঃসরণ হইল না। স্পন্দহীনের মত সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মেয়ের চিকিৎসায় রাজার পৈত্রিক ভদ্রাসনের কোবালাখানি ও রাজকন্যার মৃতা জননীর কয়েকখানি অলঙ্কার ইতিপূর্ব্বেই মহাজনের নিরাপদ লৌহ-সিন্দুকের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে ঋণে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই! আয়ের মধ্যে মাহিনার পঞ্চাশটি টাকা। বাড়ীর ভাড়া এবং মেয়ের ঔষধ পথ্যাদি দিয়া ডাক্তারের ভিজিট দিতে অর্থে কুলায় না। কাজের খাতিরে অনেক সময় তাহাকে বাহিরে থাকিতে হয়, সে সময় প্রতিবেশিনী বিনোর মা মেয়েটির তত্ত্বাবধান করিত। ঠিকা ঝি দুই বেলা সংসারের কাজ সারিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার 'ভাতে ভাত' সিদ্ধ করাটা রাজা নিজেই সারিয়া লইত। বিনোর মা মানুষটি মন্দ নয়, অত্যধিক স্নেহ-প্রবণ না হইলেও কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাহার অত্যন্ত প্রবল। অনুপস্থিতিতে মেয়েটির নিয়মিত ঔষধ-পথ্য বিষয়ে এই কর্ত্তব্য-পরায়ণা নারীর বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা যাইত না। রাজাও কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই অসময়ের সাহায্য-কারিণী করুণাময়ী নারীর প্রতি সাধ্যমত সম্মান ও যত্ন-প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না।

মেয়েটির জ্বর প্রথম কিছুকাল মৃদু থাকিয়া চারি মাস কিছু বাড়াবাড়ির দিকে চলিয়াছে। ১০০ কিম্বা ১০১ ডিগ্রী—আর কিছুতেই নামে না। ডাক্তার আসিয়া সপ্তাহে দুই তিনবার দেখিয়া যান, প্রত্যহই প্রায় প্রেস্‌ক্রুপসন বদল করা হয়। ঔষধের শিশিতে ঘর ভরিয়া গেল, তথাপি জ্বরের কোন তারতম্য দেখা যায় না। রাজা প্রতিবারই

মিনতিপূর্ণ কাতর অনুনয়ের সহিত মেয়ের জীবনের কোন আশঙ্কা আছে কি না, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারও অভ্যস্ত সহজ স্বরে "ভয় নাই"—বলিয়া আশ্বাস দিয়া থাকেন। আশঙ্কা, উদ্বেগও অসচ্ছলতার মধ্য দিয়াই দিন কাটিয়া যায়। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দর্শকেরাও "ভীলরাজের" কৌতুক ও বীররসের মিশ্র অভিনয় দেখিয়া পরম আনন্দপূর্ণ চিত্তে গৃহে ফিরিয়া থাকে।

লিলির জ্বর ছাড়িবার পরদিন সে জিদ ধরিল, থিয়েটার দেখিতে যাইবে। রাজার অভিনয়, সে অনেকবার দেখিয়াছে। বাদশাহ, রাজা, সর্দ্দার! কিন্তু সে সব রাজা ত শুধু জরির পোষাক পরিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকে, আর হাত মুখ নাড়িয়া কথা বলে! এমন পালক-ঘেরা-মুকুট-মাথায় রাজা, তীর ধনু লইয়া যুদ্ধ করিতে হয় না, সেগুলি শুধু অঙ্গের আভরণ হইয়াই আছে! গৃহে দেখিতেছে, কিন্তু থিয়েটারে ত দেখে নাই! বিনোদিনী বলিয়াছে, "রাজা যখন "বরা" শীকার করে, তখন তাকে দেখ্‌লে খুব ভয় হয়।" "কখনো নয়! লিলির একটুও ভয় করবে না।"—বিস্ময়ে অধর দংশন করিয়া পিতা বলিলেন, "বাপ্‌রে —আবার থিয়েটার? থিয়েটার দেখেই এই জ্বরে পড়লে—ও নাম আর মুখে এনো না।" মনে মনে ভাবিল, "আমিও আর বেশীদিন এখানে বাস কর্ব্ব না। তুমি একটু ভাল হলেই কাজ ছেড়ে দেব।" —বালিকা হাসিয়া তাহার কৌতুকপূর্ণ কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি পিতার মুখের প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিল, "যদি ডাক্তার বাবু বলেন, যেতে?"

"হাঁ—তাহলে নিয়ে যাব।"

লিলি ঘড়ির দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল। "আজ এখনও ডাক্তার বাবু আসছেন না কেন, বাবা?"

পাছে ডাক্তারের আগমনের বিলম্ব-হেতু মেয়ের পুনরায় জ্বর আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে রাজা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। প্রকাশ্যে সে হাসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে এসেছিলেন কি না, তাই আজ একটু দেরী করে আসচেন!"

"আচ্ছা বাবা! মানুষ মরে কোথায় যায়, জান?"

রাজা মেয়ের জন্য কাচের গ্লাসে আঙ্গুরের রস তৈয়ার করিতেছিল; সহসা সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। "কেন রে, লিলি?"

একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া অপ্রতিভভাবে লিলি বলিল, "কাল রাত্রে কে যেন আমার গায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে আমায় আদর কচ্ছিল, আমার মনে হল—। আচ্ছা বাবা, সবারই মা আছে, মা কত ভালবাসে—আমার মা আমায় স্বর্গ থেকে দেখ্‌তে আসে না—কেন, বাবা?" বাহিরে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রাজা বলিল, "সত্যি —কিন্তু ঐ শোন—ডাক্তার বাবুর গাড়ী থামল।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঔষধটায় আশাতীত উপকার-দর্শনে ডাক্তারের চির-অভ্যস্ত উদাসীন মুখেও আন্তরিক আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। "তাই ত! আজ ত তুমি বেশ আছ! জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। আচ্ছা, আজ কি খেতে ইচ্ছে করছে, বল দেখি?"

"কিচ্ছু না—আমি কিন্তু আজ নিশ্চয় থিয়েটার দেখতে যাব।"

ডাক্তার হাসিয়া লিলির হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাবে বৈকি মা—তাড়াতাড়ি কি? আগে গায় জোর হোক্!"

"না—কখনো না—আমি আজই যাব। তবে কেন বলেছিলেন, বড় দিনের আগে জর ছাড়লে নিশ্চয় যেতে দেবেন? কেন, তবে বল্লেন—? তা না হলে ত আমার জর ছাড়ত না! কেন, মিথ্যা কথা বল্লেন?" বালিকার রুদ্ধ কণ্ঠে কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নূতন প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,—সহসা চমকিত হইয়া ফিরিয়া বালিকার অশ্রুসজল কালো চোখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। "তাই নাকি? এ কথাটা ত আমার মনে পড়েনি! ভুলে গিয়েছিলেম। আচ্ছা, বুড়ী, আমি কথা রাখব। দেখুন বেণীবাবু, ইচ্ছাশক্তি জিনিষটার উপর আপনার শ্রদ্ধা আছে কি? আমি জানি—অনেক সময় প্রবল ইচ্ছাশক্তি মানুষকে তার ঈপ্সিত ফল দিয়ে থাকে।—দেখুন, আপনি এক কাজ করুন, আজ সন্ধ্যার সময় বেশ করে ঢাকাঢুকি দিয়ে পাল্কীতে শুইয়ে ওকে নিয়ে থিয়েটারে যান—কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, এক ঘণ্টার এক মিনিট বেশী নয়—এক ঘণ্টা পরেই ওকে ফিরিয়ে আন্‌বেন। কেমন লিলি, খুসী হয়েছ ত? কিন্তু—কিন্তু—বড্ড ঠাণ্ডা, শরীরে ত রক্ত নেই! দিনকতক পরে গেলেই ভাল হত।—আচ্ছা—তাহোক, কিন্তু মনে থাকে যেন, ঠিক এক ঘণ্টা সেখানে থাকবে—আর মনে খুব জোর রাখ্‌বে—" বাধা দিয়া লিলি বলিল, "জর ছেড়ে গেছে, আর আসবে না।"

বালিকা তাহার শুভ্র সুন্দর সুগঠিত ক্ষীণ হস্তে লল[illegible]স্পর্শ করিয়া

ডাক্তারকে প্রণাম জানাইয়া স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দিল, "কাল আর আমার জ্বর হবে না, আমি একেবারে ভাল হয়ে যাব, ডাক্তার বাবু—আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ভাল হয়েই গেছি। কাল রাত্রে—নাঃ—আমি বল্‌ব না।" বালিকা শ্রান্তভাবে বিছানায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সিঁড়িতে ডাক্তারের জুতার শব্দ মিলাইয়া গেলে, রাজা মেয়ের মাথার কাছে বসিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলি সযত্নে গুছাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, লিলি, কাল রাত্রে তুমি তোমার মাকে স্বপ্নে দেখেছ, না?"

একটু হাসিয়া বালিকা উত্তর দিল, "মাকে ত আমার মনে নেই, বাবা—কিন্তু—মা বোধ হয় আমায় ভুলে যান নি। স্বর্গে গেলে কি মানুষ সকলকে ভুলে যায়? আচ্ছা বাবা, মানুষ মরে ত নক্ষত্র হয়! মাও ত নক্ষত্র হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন?" সস্নেহে মেয়ের ললাটে চুম্বন করিয়া রাজা বলিল, "কিন্তু আমরা দুজনে একসঙ্গে থাক্‌ব, কেমন লিলি, আমরা কেউ কারুকে ভুলে যাব না; তা হলে, কেমন!"

৫

সেদিন রাত্রে রঙ্গালয়ে অত্যন্ত ভিড়। কত লোক টিকিট-অভাবে ফিরিয়া যাইতেছিল। যাহারা সকাল সকাল আসিয়া টিকিট কিনিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান ভাবিয়াছিল—তাহারাও লোকের ভিড়ে স্থান না পাইয়া থিয়েটারের নিন্দা করিয়া, অপরের সহিত কলহ করিয়া গোলমাল করিতেছিল। মেয়ে-মহলের ত কথাই নাই—সেখানে স্থান লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, ছেলের কান্না, মলের শব্দ, ও "জল কই, বাছা?"

"ওগো ও ঝি, লেমনেডের পয়সা নিয়ে যাও"—"পাখার বন্দোবস্ত নেই, এ কি লক্ষীছাড়া থিয়েটার গো," "আমার জন্য চার পয়সার কচুরি,—দু' পয়সার পানতুয়া," "কিগো মেয়ে, তোমার কি, বল?" "কি ঝকমারি করেই এসেছি! বেরুতে পাল্লে বাঁচি, পয়সা-খোর মিন্‌ষেরা, জায়গা নেই ত টিকিট বেচ্‌ছিস কেন? খুনে, ডাকাত।" "পটলডাঙ্গা ভবানী মিত্তিরের বাড়ি—ই"—"হরি ঘোষের লেন বিপিন মজুমদার" ইত্যাদি নানা কণ্ঠের বিচিত্র স্বর একটা প্রবল কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

রাজকন্যা পাল্কী চড়িয়া পিতার সহিত থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছে; কথা আছে, প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়া ঐকাতান বাদন আরম্ভ হইলেই রাজা তাহাকে বাটীতে রাখিয়া আসিবে।

এক বৎসর পরে সে আবার থিয়েটারে আসিয়াছে। পরিচিতগণ সাগ্রহে তাহাকে দেখিতে আসিল। সকলেই আন্তরিক আনন্দের সহিত তাহাকে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আদর করিতেছিল! বালিকাও হাসিমুখে ক্ষীণ কণ্ঠে দুই একটি কথা কহিতেছিল। পাছে অধিক পরিশ্রমে তাহার অসুখ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে রাজা তাহাকে লোকচক্ষু হইতে গোপনে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। ম্যানেজারের আদেশে একটি স্বতন্ত্র বক্সে রাজ-কন্যার জন্য শয়নের স্থান করিয়া দেওয়া হইল।

প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হইল। গভীর বনমধ্যে দেবাদিদেব ত্রিশূলপাণির মন্দির। কাল সন্ধ্যা! সম্মুখে রজত-তরঙ্গময়ী নদী। জলে চাঁদের ছায়া তরঙ্গে তরঙ্গে হীরক-চূর্ণ ছড়াইতেছিল। দূরে বনরাজি-নীলা তটভূমি। মন্দির-মধ্যে ধ্যানমগ্ন ভীলরাজ! দৃশ্যটি ছবির মত মনোহর।

দর্শকেরা চিত্রার্পিতের মত দেখিতেছিল। সহসা সুদূরে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, "কে আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর!" যোগীর যোগভঙ্গ হইল, চারিজন দস্যু মিলিয়া লতাগুল্মে হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া এক কিশোরীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। রমণী কাতর স্বরে দেবতা ও মানবের নিকট উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছে!

হুহুঙ্কার শব্দে ভীলরাজ দস্যুদের উপর পতিত হইল। তাহারাও শিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয় কাহার ঘটিবে, তাহা বুঝা যাইতেছিল না। সহসা ভীলরাজের দৃষ্টির সহিত উপরের দুইটি উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত নীল আকাশের মত আলোক-ময় কালো চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির মিলন হইল। ভয় নাই, ভয় নাই লিলি, এ শুধু খেলা! কিন্তু সে কথা মুখে ত বলা চলে না! আত্মবিস্মৃত রাজা সহসা একজন দস্যুর পৃষ্ঠে আঘাত করিল। আঘাত সত্যকার, সুতরাং আহতকে তখনই হঠিয়া যাইতে হইল। ব্যাপারটা এমনই স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল যে, দর্শকদের মধ্যে করতালি ও আনন্দ-প্রকাশক কোলাহলের অভাব হইল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই "সিন্" পড়িয়া "ঐক্যতান" বাদন আরম্ভ হইয়া গেল।

আহত ব্যক্তির শুশ্রূষায় রাজার অবসর-কালটুকু ফুরাইয়া গেল। অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই সে আহতের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সহসা এই অতর্কিত দুর্ঘটনায়, আপনার স্বার্থ-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার অবসর ছিল না। বিশেষত এ দুর্ঘটনা তাহারই আত্মবিস্মৃতি ও অসাবধানতার ফলে ঘটিয়াছে! আঘাত তেমন গুরুতর নহে, আহত

ব্যক্তি অল্পক্ষণ শুশ্রূষা ও বিশ্রাম লাভ করিয়া আবার আপনার নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা-অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু গোলমালে রাজার আর মেয়েকে বাড়ী রাখিয়া আসা ঘটিল না। অপর লোকের সহিত লিলিকে বাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বেই রাজার আবার মঞ্চোপরি ডাক পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজার সহিত বন্য বরাহের যুদ্ধ! রাজা ভীত হইল। খুব সম্ভব গল্পটির শেষ পর্য্যন্ত লিলির জানা নাই! গল্পের বিষয়—গুপ্ত ঘাতকের বন্দুকের গুলিতে রাজার মৃত্যু! মৃত্যুর পর গল্পের চির প্রথা-অনুসারে সন্ন্যাসীর অমানুষিক যোগবলে রাজার পুনর্জীবন লাভ, এবং সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ! কিন্তু সে সব কথা লিলিকে জানায় কে? কুঞ্চিত ললাটে, হাতে হাত ঘষিয়া, বারবার সে নিজকে মূঢ় বলিয়া ধিক্কার দিল। এই তুচ্ছ বিষয়টা এতদিন সে মেয়ের নিকট গল্প বলিয়া রাখে নাই! কিন্তু লিলি ছেলে বেলা হইতে অনেকবার থিয়েটার দেখিয়াছে, যদিও সে নিদ্রাতুরা—আরম্ভে একবার চেয়ারেয় উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তবু কখনও কি সে রঙ্গমঞ্চে মৃত্যু-দৃশ্য দেখে নাই? কৈ, কখনও ত ভয়ের কথা বলে নাই বা চীৎকার করিয়া গোল বাধায় নাই! না—কখনই সে ভয় পাইবে না! জোর করিয়া বারবার মনে মনে "না" বলা ছাড়া তখন আর আপনাকে সান্ত্বনা দিবার অন্য পথও ছিল না! সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

বরাহ-শীকারে রাজার লম্ফ-ঝম্ফ, চীৎকার ও বীরত্ব-প্রদর্শন কিছুই অন্য দিনের মত স্বাভাবিক বা প্রাণস্পর্শী হইল না। নিরাশা-ক্ষুণ্ণ দর্শকগণের

হর্ষোচ্ছ্বাস ও আনন্দ-কোলাহলে রঙ্গভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল না।

রাজার আজ আর কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না। জগতের নিন্দা বা সুখ্যাতিতে তাহার কিছুই যায়-আসে না—তাহার উৎকণ্ঠিত নয়নের দৃষ্টি ঊর্দ্ধে বার বার বালিকাকে অভয় জানাইতেছিল।

মৃত বরাহের নিকট দাঁড়াইয়া রণ-শ্রান্ত "ভীলরাজ" পৌষের শীতে ললাটের স্বেদ মোচন করিতেছিল। সহসা অতর্কিতভাবে পশ্চাৎ হইতে "গুড়ুম" করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। "মাগো" বলিয়া রাজা মৃতের অনুকরণে মাটীতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সহসা একটি ক্ষীণ করুণ কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শুনা গেল, "বাবা! বাবা!" এ স্বর—এ স্বর্গের বীণাঝঙ্কার—এ আকুল আর্ত্ত আহ্বান, এ ত থিয়েটারের নয়। এমন হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতা ত কৃত্রিমতার মধ্যে সৃষ্ট হইতে পারে না! দর্শক, প্রদর্শক, সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি শব্দ লক্ষ্য করিয়া উপরের পানে ছুটিল।

মৃত রাজা আপনার কর্ত্তব্য,স্থান, কাল, সমস্ত ভুলিয়া জীবনদাতা সন্ন্যাসীর আগমনের অপেক্ষামাত্র না রাখিয়াই সম্মুখের লোকদিগকে ঠেলিয়া পাগলের মত ছুটিল।

একটা চেঁচামেচি, গোলমাল!—কি হল? ব্যাপার কি? পাখা আন! জল দাও! ডাক্তার! প্রভৃতি শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল।

সংজ্ঞা-হীনা "রাজকন্যা"কে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাজা মেজের উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল। তাহার চক্ষে জল নাই। ওষ্ঠে একটি ক্ষীণ শব্দও বাহির হইল না। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আকস্মিক ভয়ে হার্ট ফেল হওয়ায় দুর্ব্বল বালিকার মৃত্যু ঘটিয়াছে!"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস

পোষ্যপুত্র

দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বহল পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে। সুবৃহৎ কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বাঙ্গালী গৃহের মনোরম চিত্র। বিচিত্র রসের খনি। ভাবে ভাষায় উজ্জ্বল, চরিত্র-চিত্রণে অপূর্ব্ব। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

সকল গ্রন্থগুলিই উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে, পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, ৪১ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়া, ভূদেব ভবনে, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।